পথপ্রদর্শক

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
২৫শে জুন, ২০০৬

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

অনন্ত জীবনে চলার পথে আমরা বিভিন্নরূপে এক একবার জন্মাচ্ছি, আর মরছি। এর শেষ কোথায়? স্রষ্টা যে নিয়মের মাঝে চলেছেন এবং সৃষ্টি করছেন, তাহলে এই কি তাঁর ইচ্ছা যে, আমরা শোক পাব, দুঃখ পাব, ব্যথা বেদনা, রোগ যাতনা ভোগ করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে আবার দেহ নিয়ে (বিভিন্নরূপে) আসব? শুধু এইটুকু উদ্দেশ্যের জন্যই কি এতবড় জীবজগৎ? তা তো হতে পারে না। তবে এর শেষ কোথায়? কে জানাবে সেই শেষের কথা? কে জানাবে আমাদের এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিচিত্র রহস্যের কথা?

একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, নিজেকে চালানোর জন্য বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুই তার থাকে না। মা তাঁর নিজস্ব ভাবধারায় শিশুকে লালন পালন করেন। তিনি (মা) যেমন করে শিশুকে guide করেন, শিশু ঠিক সেইভাবেই আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে। এখানে শিশুর নিজস্ব ভালমন্দ বলে কিছুই থাকে না। মা ও সন্তানের সম্পর্কে যেমন কোন দেনা পাওনা নেই, তেমনি কোন মান অভিমান, অভাব অভিযোগও নেই। সন্তানের শুভ কামনাই মায়ের একমাত্র ব্রত (লক্ষ্য)।

আমরা অনন্ত পাথের যাত্রিক। জীবনের চলার পথে আমাদের (জীবের) জাপ্য ক্ষমতাগুলি সঠিকভাবে জাগিয়ে তোলাবার জন্য (মায়ের মতই) একজন গুরুর প্রয়োজন। গুরু অর্থাৎ যিনি গতিদাতা; যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জীবকে (মানুষকে) জ্ঞানের পথ, আলোর পথ দেখান। যে কোন বস্তু যেমন চকচক করলেই সোনা (gold) হয় না, তেমনি গুরুর আসনে বসলেই প্রকৃত গুরু হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জগতে প্রকৃত গুরু হওয়ার অধিকার তাঁরই, যিনি পূর্ণ হয়েই আসেন। এই ধরাধামে এসে নূতন করে তাঁকে সাধন ভজন কিছুই করতে হয় না অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি মহান হয়েই আসেন, এই বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন, যিনি গতিদাতা হয়ে জন্মের সাথে সাথে গতির পথ দেখাতে শুরু করেন, তিনিই একমাত্র জীবের (মানুষের) জাপ্য ক্ষমতাগুলি সঠিকভাবে জানিয়ে দিতে পারেন।

অনন্তপথের যাত্রিক হয়ে গুরুর তত্ত্বের সাথে সঙ্গত করে জন্মমৃত্যুর মাঝপাথে প্রকৃতির গতির টানে যেতে যেতে জেনে নিতে হবে আমাদের (পথিকদের) সৃষ্টিতত্ত্বের অনন্ত রহস্যের সমাধান।

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বেদতত্ত্ব কখনও একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে কখনো বা বিভিন্ন মীটিং ও ধর্মসভায় শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব পান্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণ আকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন (প্রকাশন) বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন **অভিনব দর্শন**।

অভিনব দর্শন প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে. একাদশ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **পথপ্রদর্শক**।

পরিশেষে পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ উপনয়ন দিবস (১০ই আষাঢ়) উপলক্ষ্যে ১২ বছরের দেবতনু চক্রবর্ত্তী তার উপনয়ন দিনে ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষার ঝুলির সমস্ত অর্থ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এই বই প্রকাশনার কাজে সাহায্যের জন্য। এই ছোট ছেলেটির মহান দৃষ্টান্ত সত্যিই আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। এছাড়া শ্রীঅনির্বাণ জোয়ারদার, ও যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোনেরা এই সুবিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩ — *চপল মিত্র*
২৫শে জুন, ২০০৬ — *(প্রকাশক)*

এই জীবনটা হল স্লেট পেন্সিলের খেলা। লিখলাম আর থুঃ দিয়ে মুছে ফেললাম

দীঘা - সমুদ্রভিলা
৬ই এপ্রিল, ১৯৮১

মা তার সন্তানের জন্য সদা ব্যস্ত। তাকে সদ্‌ভাবে রাখার জন্য ব্যস্ত। বাচ্চার কান্নায় সে ভুলে যাচ্ছে। এমন মা আছে চুরি করে, অপরের ক্ষতি করে। নানারকম বদামি করতাছে, পয়সা মারতাছে, পরপুরুষের লগে ঘোরাঘুরি কইরা টাকা রোজগার করতাছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিজের সন্তানের জন্য তার প্রাণ হাহাকার করছে। সন্তানের কাছে তো সে সৎ হইয়াই রইছে। তাকে খাওয়াবার জন্য মায়ের ব্যস্ততার সীমা নাই। যে ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি যা কিছু কইরা পয়সা আনতাছে, তারও সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা অপরিসীম। তাহলে চোর, ডাকাত হোক আর যত খারাপ মা-ই হোক মা, বাবার সততা বুদ্ধি তো সন্তানের কাছে ঠিকই আছে। কথাটা বুঝতে পেরেছ? তাহলে অর মধ্যে সদ্‌গুণ নাই, একথা তুমি বলতে পারবে না। সেই সদ্‌গুণটা তুমি সন্তানের কাছে রক্ষা করলা। তুমি পাঁচজনের কাছে অসৎ হইলা, পাঁচজনের কাছে অসৎগিরি কইরা আসলা। একজনের কাছে তো তুমি সৎ রইলা। ঐ সততাটা তুমি পাঁচজনের কাছে রক্ষা করতে পার, by will ইচ্ছাকৃতভাবে। তোমার মধ্যে সেই শক্তি ন্যস্ত রয়েছে। Nature তোমাকে natural gift হিসাবে অনেক কিছুই দিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি 'নাই' বল, তাহলে কি করে হবে?

এমন মা আছে চুরি করে, অপরের ক্ষতি করে। নানারকম বদামি করতাছে, পয়সা মারতাছে, পরপুরুষের লগে ঘোরাঘুরি কইরা টাকা রোজগার করতাছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিজের সন্তানের জন্য তার প্রাণ হাহাকার করছে।

মা তার বাচ্চাকে কি করে রক্ষা করে? বাচ্চা তো পর। পেটে ধরলে কি হবে? ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তো পর হয়ে গেল। তার নাক, মুখ, চোখ আলাদা, চেহারা আলাদা, নাম আলাদা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আলাদা। কে আগে যাবে, কে পরে যাবে, কোন ঠিক নাই। একটু touch দিয়েছে nature তোমাকে। তোমার যন্ত্রে তারটা যে ঠিক আছে, সেটা দিয়ে বুঝিতে দিল যে, যন্ত্রটা (দেহযন্ত্রটা) ঠিক আছে। এখন যাও বিচার দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা দিয়ে ঐ যন্ত্রটা ঠিকঠাকমত সবজায়গায় খাটাও। Nature এতকিছু দিয়েছে এমনি? অন্যের কাছে তুমি অসৎ গিরি করবা, অন্যের অর্থ লুঠপাট করবা, অন্যের ধন লুঠপাট করবা, অন্যের স্ত্রীর প্রতি লোভ করবা, এমনি তোমাকে ছেড়ে দেবে nature?

মা তার বাচ্চাকে কি করে রক্ষা করে? বাচ্চা তো পর। পেটে ধরলে কি হবে? ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তো পর হয়ে গেল। তার নাক, মুখ, চোখ আলাদা, চেহারা আলাদা, নাম আলাদা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আলাদা। কে আগে যাবে, কে পরে যাবে, কোন ঠিক নাই।

কই, কোন মা তার ছেলের লগে প্রেম করতে গেছে? সেখানে প্রেমের কোন চিহ্ন পাবে? কোন মা তার ছেলের লগে প্রেম করতে যায় না। মা তার সন্তানের সাথে প্রেম করতে যায় না। প্রেম ঠিকই আছে, অপার স্নেহ মমতা। একটা জায়গায় কাম দমন হইয়া রইছে। এই কাম দমন হয় একটা জায়গায়, এটাই দেখা গেছে। মা উলঙ্গ, ছেলে তাকাবেই না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? সন্তান তাকায় না। তুমি যে নিজেকে check করতে পারবা, checking power-টা যে তোমার আছে, তার দৃষ্টান্ত, তার নজির দেখিয়ে দিয়েছে। মনে রেখো কথাগুলো। মা যদি এই ঘরে ল্যাংটা হয়ে শুয়ে থাকে, সেই ঘরে ছেলের যেতে ইচ্ছে করবে না, তাকাতেই ইচ্ছে করবে না। আরেকজনরে বলবে, 'মা ওঘরে আছে, কাপড়টা ঠিক করে দাও না।' এই বলার মধ্যে স্বচ্ছতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সততা আর মায়ের প্রতি সম্ভ্রমবোধ ফুটে উঠেছে। এতবড় যে কাম, সেও কচ্ছপের মত হয়ে গেছে। দরজা খোলা দেখেও সেখানে তো কামটা জাগেনি, বল? আর সর্বত্র কাম

এতবড় যে কাম, সেও কচ্ছপের মত হয়ে গেছে। দরজা খোলা দেখেও সেখানে তো কামটা জাগেনি, বল? আর সর্বত্র কাম জাগছে।

জাগছে। তাহলে তোমার checking power নাই, একথা বলা যাবে না। Checking power না থাকলে সেখানেও জাগতো। কি সুন্দর। তাই 'পারি না' একথা বললে চলবে না। 'পারি না' বলছো কেন? পারতাছ তো তুমি। সেগুলি তুমি যদি বসে বসে অপচয় কর, তারজন্য দায়ী তুমি। এদিক তাকালাম, ওদিক তাকালাম, একটু ঠাসা দিয়া চললাম, এইসবগুলি কুড়াতে কুড়াতে চলছো তোমরা। মনে মনে ভাবলা, কে আর দেখলো?

কে দেখলো? ওরে বাবা। একেবারে স্তর পইরা যাইব গিয়া, পাহাড় সমতুল্য। ধাপা, ধাপা এক্কেবারে ধাপা। জমতে জমতে অপরাধের পাহাড় হয়ে যাবে। একেবারে ডুবে যাবে। বৌ জানে না, স্বামী ভাল। স্বামী জানে না, বৌ ভাল। এদিকে রাস্তা দিয়া কুড়াইতে কুড়াইতে চলছে। আমার কাছে আসছিল আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে, দুজনে ভালবাসছে। বিয়া করবে কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করছে। এই ব্যাপারটা আমার উপরে ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেটা জিজ্ঞাসা করছে মেয়েটা সৎ তো? মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে, ছেলেটা সৎ তো? আমি বলি, 'সৎ' কথাটার ব্যাখ্যাটা কি? কারও লগে মিশে নাই, কারও লগে যায় নাই, কিছু করে নাই, এইভাবে চাচ্ছ তো? বলে — হ্যাঁ।

ছেলেটা জিজ্ঞাসা করছে মেয়েটা সৎ তো? মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে, ছেলেটা সৎ তো? আমি বলি, 'সৎ' কথাটার ব্যাখ্যাটা কি?

— আর অন্যভাবে চাও নাতো?

— অন্যভাবটা কি?

আমি ছেলেটাকে বলি, তোর মধ্যে দেখতাছি ৬১টা মেয়ে নাচতাছে। আর মেয়েটারে বললাম, তোর মধ্যে ১৪টা ছেলে খেলতাছে। মেয়েটাতো মাথায় হাত দিয়া বইয়া পড়ছে। বলে, আমার মধ্যে ১৪টা ছেলে কেন খেলতাছে?

আমি বলি, 'তুমি বাসে গেছ, ট্রামে গেছ, রাস্তা দিয়া গেছ, উঁচা লম্বা ছেলে দেখছো। সিনেমা দেখছো, নায়করে দেইখা আহা, আহা করছো। এই আহা, আহা-র মধ্যে এইরকম যদি একটা ছেলে পাইতাম। আমার স্বামী

যদি এই রকম হইত, এই ছেলেটা কি সুন্দর; এই সবগুলি ফটো তুইলা তুইলা তোমার ভিতরে নিয়া নিছে। তোমার ভিতরে বাসা বাইন্ধা ফেলাইছে'। ছেলেটারে বলি, ক্যামেরায় যেমন তোলে, এইরকম তুইলা ফেলাইছ। তুলছো কি না?

— হ বাবা, তাতো তুলছি।

এইটা যদি দুইজনে দুইজনেরটা মাইনা (মেনে) নাও, তাইলে বিয়া কর। আর যদি মনে কর, এইটা অপরাধ, তাইলে বিয়া করবা কি না চিন্তা কর। তাদের চিন্তায় তাদের ছবিগুলি ভিতরে আইয়া পড়ছে। আমি বলে দিতে পারি, কার কিরকম চেহারা। এইরকম কইরা যদি দেখতে যাই, তবে আর কি বিয়া হইব? এইরকম কইরা বিচার করতে যায় কেউ?

অজান্তে কেউ suicide করতে পারে না। মরবে জেনেই suicide করছে। মহাকাশে যে আত্মাগুলি ঘুরছে, সেতো আমরা জানি না। যারা মারা গেছে তারা জানে। যারা মরছে তারা এটা না জেনেই মরছে। আমরা না ঘুইরাই জানতাছি। আমাদের জানতে হবে। সেইজন্যই তো advice. সেইজন্যই তো তত্ত্ব শুনতে হয়। কেউ মনে কর, না জেনে আগুনে হাত দিয়েছে। Fire তাকে ক্ষমা করবেনা। কেউ হয়তো ভুল বুইঝা একটা কাম কইরা ফেলাইছে। পরে দেখা গেল, কামটা (কাজটা) ঠিক করে নাই। আমার সহপাঠী ছিল মান্না। সে একজনরে কইছে, তুই ফেল (fail) করছোস। সে শুইনাই গলায় ফাঁস দিছে। পরে দেখা গেল, সে পাশ করছে। ভুল বোঝাবুঝিতে এরকম হয়। সেইজন্যই বলছে, ধারণার বশে চলবা না। ফাঁকটা এখানেই। আগে শোন, দেখ, বোঝ। চিন্তা করবে, অন্যায় যদি করে থাকি, করেছি অন্যায়। কারও সামান্য কথার ওপরে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে যাব কেন? 'ও' কি এমন দক্ষ যে, ওর কথায় আমি মরবো? আমি মরে

অজান্তে কেউ suicide করতে পারে না। মরবে জেনেই suicide করছে। মহাকাশে যে আত্মাগুলি ঘুরছে, সেতো আমরা জানি না। যারা মারা গেছে তারা জানে। যারা মরছে তারা এটা না জেনেই মরছে। আমরা না ঘুইরাই জানতাছি।

গেলে ওর কি হবে? কিছুই হবে না। কিছু আসবে, যাবে না। আরেকটা বিয়া কইরা বইয়া থাকবো। যে মরলো, সে মরলোই। কয়েকদিন দুঃখ করলো। পোলাপানরা শিলেট (স্লেট) পেনসিল দিয়া একবার লেখে, আবার থুঃ কইরা মুইছা ফেলাইয়া দেয়। কয়দিন দুঃখ করলো। তারপর বিয়া কইরা ফেলাইল। সে পরিষ্কার হইয়া গেল। শিলেট পেন্সিলের খেলা। এখন জীবনটা হইল শিলেট পেন্সিলের খেলা। লিখলাম আর থুঃ দিয়া মুইছা ফেলাইলাম। লাভটা কি হইল? বৌ মারা যাওনের লগে লগে ঐ ছেলেটা আবার আরেকজনের লগে প্রেম করলো। বুঝছোস্? কথাগুলি মনে রাইখো। জন্মগতের লগে কথা হাওলাত (ধার করা) করা কথা না। এতটুকু বাচ্চাবয়স থেকে প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছি। কোন অবস্থাতেই কারও কথায় মরবে না, মরার চিন্তাও করবে না।

পোলাপানরা শিলেট (স্লেট) পেনসিল দিয়া একবার লেখে, আবার থুঃ কইরা মুইছা ফেলাইয়া দেয়।

সামনে পাহাড়। তাই লেখা আছে, সাবধান, সাবধান, সাবধান। সামনে পাহাড়; এত সরু রাস্তা যে একটা পা শুধু ফেলা যায়। একটু অন্যমনস্ক হইলেই কিন্তু দুই মাইল নীচে পরবা। এই বিপদ সঙ্কুল রাস্তা দিয়ে যারা আবিষ্কার করতে যায়, একটা পা ফেলে, wall ধরে, আবার একটা পা ফেলায়। প্রতি মুহূর্ত্তে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলতে হয়। একটু অসতর্ক, একটু অসাবধান, একটু বেকায়দায় পা ফেললেই কিন্তু ব্যাস। ঐ যে নজর, সেটা রাখতে হবে সদাসর্বদা। আজকে তোমরা সেই বিপদ সঙ্কুল পথ দিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে step ফেলাচ্ছ। একটু যদি বেসামাল হও, একটু যদি এদিক ওদিক তাকাও, তাইলেই কিন্তু বিপদ। ধুয়া টানতে গিয়া জ্বলন্ত কাঠিটা মনে কর, অসাবধানে এদিকে পড়লো, তাইলেই কিন্তু আগুনে শেষ হইয়া গেলা, উপায় নাই। এইজন্য প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সাবধানতার বাণী। রাস্তায় রাস্তায় লেখা থাকে, সাবধান, সাবধান। এইখানে উঁচুনীচু আছে, এখানে হাসপাতাল আছে, ইস্কুল আছে, বাম্পার দিয়া দেয়। দেইখা, শুইনা

আজকে তোমরা সেই বিপদ সঙ্কুল পথ দিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে step ফেলাচ্ছ। একটু যদি বেসামাল হও, একটু যদি এদিক ওদিক তাকাও, তাইলেই কিন্তু বিপদ।

যাও, সাবধান সাবধান। এইজন্যই বলছে, সাধু হও সাবধান। প্রতিমুহূর্ত্তে অঙ্গে অঙ্গে লেখে তিলকের মাধ্যমে সাবধান, সাবধান।

এই যে ফোঁটা কাটা, তিলক, এগুলি কেন? প্রতি মুহূর্ত্তে বলছে, caution, সাবধান, সাবধান। সাবধান, সাবধান। এই বাক্‌শক্তির জায়গায় গলকম্বলে দিয়েছে ফোঁটা, সাবধান। এইখান থিকাই কথা বাইর হয়, সাবধান। কানে ফোঁটা দিয়েছে, সাবধান। কপালে আজ্ঞাচক্রে দিয়েছে সাবধান। দৃষ্টি সংযত কর। বিশুদ্ধে দিয়েছে ফোঁটা বাক্‌সংযত কর। বক্ষে অনাহতে হৃদয়ের প্রসারতা আন। বাহুতে দিয়েছে ফোঁটা, অযথা হাত বাড়াবে না। অযথা অপরাধের সাড়ায় হাত বাড়াবে না। তাইলে? নাভিতে দিয়েছে, এটাই বাঁচবার পথ। সাবধান। মাতৃগর্ভে শিশুর এই নাভিমূলে খাওয়া; নাড়িটা এই মূলের সাথেই যুক্ত। স্বাধিষ্ঠান, সৃষ্টির দ্বার। সৃষ্টি রক্ষা পেয়েছে এখানে, সাবধান। কতগুলো সাবধান করে দিয়েছে। তারপর দিয়েছে কণ্ঠীতে তুলসীর মালা। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কণ্ঠীর বেড় দিয়ে দিয়েছে। যেমন গল্পে আছে, সীতাকে গন্ডী দিয়ে দিয়েছিল। এখান থেকে বার হবে না। যেই আসুক, দাগের বাইরে যাইবা না। কণ্ঠী হল সেই দাগ। তুমি তোমার বাক্ সংযত কর। দৃষ্টি সংযত কর। শ্রবণ সংযত কর। এই কণ্ঠীর বেড় থেকে তুমি বাহির হইয়ো না। যতরকম সুযোগ আসুক, যতরকম প্রলোভনই আসুক হে পথিক, তুমি এই গন্ডীর বাইরে যেও না, যেও না।

আর তোমরা কি করছো? প্রতিমুহূর্ত্তে গন্ডীও আছে। আবার বাইরে গিয়া খাইয়া আইলা। আদেশ অমান্য কইরা বাইর হইলা, কত কিছু করলা। তাই রাবণের হাতে সীতার অপহরণ হলো। রামায়ণ রচনা হয়ে গেল। তারফলে কি হইল। সেই রাবণের ঘর থিকা সীতা আইল। প্রজারা সীতাকে সন্দেহ করলো। সীতার বনবাস হলো। এর কারণটা কি? সমাজের একটা picture তুইলা দিল। গন্ডীর বাইরে গেলে কি হয়, মানচিত্রে দেখিয়ে দিল।

আর তোমরা কি করছো? প্রতিমুহূর্ত্তে গন্ডীও আছে। আবার বাইরে গিয়া খাইয়া আইলা। আদেশ অমান্য কইরা বাইর হইলা, কত কিছু করলা।

আবার মাথায় শিখা দিয়া দিছে। শিখার উপরে এইখানে (মস্তকে) ফোঁটা দিয়া দিছে।

ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু। তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদম্‌। সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবিব চক্ষুরাততম্‌।

আবার চক্ষুতে ফোঁটা দিল। অনেক সময় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সর্বত্র বিষ্ণুকে স্মরণ করা হয়। আবার খাবার সময়

— ওঁ নাগায় নমঃ কূর্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, দেবদত্তায় নমঃ, ধনঞ্জয়ায় নমঃ। এরা হলেন পঞ্চদেবতা, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। তারপর নাগায়, কূর্মায়, অনন্তায়, দেবদত্তায়, ধনঞ্জয়ায়, এই পঞ্চদেবতাকে নমষ্কার করে স্মরণ করে আচমন করলেন।

আবার ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা। এরা হলেন পঞ্চ বায়ু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি। এদেরকে সমতুল্য রেখে, সবাইকে স্মরণ করে আমি জলগ্রহণ করলাম। হে বায়ু, হে পবন, হে অগ্নি, হে মাটি, হে সমস্ত উদ্ভিদ, হে সমস্ত জীবলোক সবাইকে স্মরণ করে, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি জলগ্রহণ করলাম। তারপরে কি? জলগ্রহণ করার পরে পাত্রত্যাগ। অমৃত পিধানামসি স্বাহা অর্থাৎ অমৃত পান করে, সবাইকে স্মরণ করে আমি পাত্রত্যাগ করলাম। এই রকম প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্ব বিরাটকে স্মরণে রাখার জন্য এইরকম অঙ্গে অঙ্গে দাগ দিয়ে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ কর। তোমার শুভ চিন্তার ভিতর দিয়ে জীবনকে সুন্দর কর। যাত্রায় (গমনে), কাজে কর্মে, পূজা-পার্বণে নানা বিধিনিষেধ কেন দিয়েছে, নানা নিয়ম কানুন কেন করেছে? না হলে তো কেউ করবে না। এই জন্য যাত্রায় শুভ চিন্তা, প্রণাম আশীর্বাদ — শুভ চিন্তাটা যেন সবসময় থাকে। চিন্তায়

তোমার চলার রাস্তা দিয়া একটা পিঁপড়া যাচ্ছে। Nature তোমাকে এরকম সাবধান করে দিয়েছে, তুমি সেইভাবে চল, হামাগুড়ি দেবার মত দেখে দেখে চল। নজর দিয়া চল। তুমি সবসময় নজর দিয়ে চলবে। তবেইতো একে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি নিয়ে তুমি চলতে পারবে। তবেই তোমার সবকিছুর প্রতি শুভ কামনা থাকবে এবং প্রকৃতি তখনই তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবে।

ভাবনায় সদাসর্বদা এই বাঁধনে থাকবে, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাকে সতর্ক করবে। এই দৃষ্টি রেখে চলবে। তোমার চলার রাস্তা দিয়া একটা পিঁপড়া যাচ্ছে। Nature তোমাকে এরকম সাবধান করে দিয়েছে, তুমি সেইভাবে চল, হামাগুড়ি দেবার মত দেখে দেখে চল। নজর দিয়া চল। তুমি সবসময় নজর দিয়ে চলবে। তবেইতো একে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি নিয়ে তুমি চলতে পারবে। তবেই তোমার সবকিছুর প্রতি শুভ কামনা থাকবে এবং প্রকৃতি তখনই তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। এইসব সুর নিয়ে, এইসব শুভ কামনা নিয়ে, অনন্ত বিশ্বের সুর নিয়ে তোমার আত্মা যখন বহির্গত হবে, যখন তুমি (তোমার আত্মা) বের হবে, তখন দেখবে, কি সুন্দর। 'রথ' বলে একটা কথা আছে না? রথ কি? যাত্রার পথ। তোমার যাত্রার পথ এমন সুন্দর সুগম থাকবে যে, মনে হবে যেন, তোমার জন্য তারা প্রতীক্ষা করে বসে আছে। **আর প্রত্যেকের শুভ কামনায় যারা যাবে, তাদের দরজাগুলো পরপর পরপর সেইভাবেই খোলা থাকবে।**

কেমন লাগলো? ভাল লাগছে? আর ফইচ্‌কামি করবা, নাচানাচি করবা, আর বইয়া বইয়া খালি এদিক ওদিক মন দিবা, এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে চলবা, ছ্যাঁচাটা ঠিক খাইবা এইখানে। যাও। ভালো লাগছে তোমাদের? তৈরী হইও। আমারে দিয়া খাটাইলা তো। আমার ১ মিনিট সময় নাই।

মনের ভিতরে যত ক্লেদ পঙ্কিলতা আছে, পরিষ্কার কর। এছাড়া জট পাকানোই বেশী। জটই পাকাইতেছে। তোমরা বল। বল, 'আমাকে মুক্ত কর। আমি তো বুঝতে পারতাছি না। আমাকে, যা শাস্তি দেবার দাও। আমার চোখ খুলে দাও।' এই যে কান্না, এই যে দুঃখ, এই যে ব্যথা ঐ acid-action হচ্ছে। আগুনে যেমন পুইড়া ফেলায়, তেমনই acid-action হচ্ছে।

এই যে দুঃখ, এই যে ব্যথা ঐ acid-action হচ্ছে। আগুনে যেমন পুইড়া ফেলায়, তেমনই acid-action হচ্ছে।

স্বীকারোক্তি করলে কমে যাবে, অনেক কমে যাবে। স্বীকারোক্তি করার সাথে সাথে কমতে থাকে।

স্বীকারোক্তি করলে কমে যাবে, অনেক কমে যাবে। স্বীকারোক্তি করার সাথে সাথে কমতে থাকে।

একজন সাধক কিভাবে শাসনের গন্ডীর মধ্যে নিজেকে রেখে তৈরী করেছিলেন। তিনি ভাবতেন আমি দেবদেবতার কথা জানি না। আমার স্বচ্ছ পবিত্রতার চিন্তায় আমি কোনরকম কোন গাফিলতি করবো না। তার ১২ জন ভক্ত, তার কাছে থাকতো। নিজের ত্রুটিগুলি সারাবার জন্য তিনি ১২ জন ভক্তের হাতে ১২টা চাবুক দিয়ে বললেন, যদি দেখ, আমি এদিকে তাকাই, ওদিকে তাকাই, আমাকে ঠাটিয়ে ঠাটিয়ে মারবে, আমার পিঠে চাবুক মারবে।

— আমরা কি করে আপনাকে চাবুক মারবো, তারা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে।

— না মারলে বুঝবো, আমার আদেশ অমান্য করলা। ১২টা লাঠি ১২জনের হাতে দিয়ে দিছেন। সেই সাধক তার খাওয়া শোওয়া সব কিছু সেই ১২ জন ভক্তের মাঝখানে করেন। ১২ জনের মাঝখানে শুইয়া থাকেন। ৩/৪ জন ভক্ত জেগে থাকে। খাওয়ার সময়ও তাই।

সাধক বলতেন, তোমরা নিরপেক্ষভাবে আমার এই চারা গাছটারে রক্ষা করবা। আমার যদি কোন বেয়াদপিপনা দেখ, আমি কাউকে বিনা কারণে ডাকছি, 'আয় আয়' করছি, আমাকে ঠাটাইয়া চাবুক মারবা। তাই করতো ওরা। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক করতো আর ঠাটাইয়া ঠাটাইয়া মারতো। মাঝে মাঝে ভুলেও চাবুক মেরে ফেলতো। উনি হেসে ফেলতেন, দুঃখ করতেন না।

ভালই করেছ, আমাকে মেরেছ। এই কাজটা আমি এমনি করছিলাম। ভালই করেছ, মেরেছ। এইভাবে সেই সাধক নিজেও তৈরী হয়েছেন, ওদেরও তৈরী করেছেন। ওরা ঠাটাইয়া ঠাটাইয়া মারতো। ওরাও তৈরী হয়ে গেছে।

যেই দেখতো, বেহুঁশভাবে শুয়ে আছে, ঠাটাইয়া মারতো।

— মেরেছ, ভালই করেছ, এটা আমার অজান্তে হয়ে গেছে। ল্যাংটা হইয়া বাতি জ্বালাইয়া রাইখা শুইয়া পড়তেন। কারও কোনরকম কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতেন না। একটু এদিক সেদিক দেখলেই ঠাটাইয়া পাছার মধ্যে বাড়ি মারতো।

তিনি বলতেন, খুশী হইলাম। জীবনটাকে এইভাবে check কইরা, সংযতভাবে, সুন্দরভাবে কাটিয়ে গেলেন।

সাধক দেখেছিলেন, এমনিতে সুবিধা হবে না। এমন একটা শাসনের মধ্যে আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, ওরাই সেটার guard. ওরা guard দেওয়াতে অনেকটা safe হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, মান-অপমান, কোন কিছুর মধ্যে আমি যাব না। কি সুন্দরভাবে জীবনটা কাটিয়েছেন।

সাধক দেখেছিলেন, এমনিতে সুবিধা হবে না। এমন একটা শাসনের মধ্যে আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, ওরাই সেটার guard. ওরা guard দেওয়াতে অনেকটা safe হয়ে গেল।

মনে একটা ইচ্ছা হইল, রান্নাটা ভারী চমৎকার। কি সুন্দর, খেতে ইচ্ছা করলো। মনে মনে খাওয়ার ইচ্ছা, তার যে result, আর ঐখানে গিয়া বইয়া খাবলা দিয়া খাওয়া, দুইটার মধ্যে মাত্রাগত তারতম্য হবে অর্থাৎ বেশী কম হবে। তিনি অনুশোচনা দিয়া অনেকটা কাটাইয়া কাটাইয়া নিতাছেন। একটা সুন্দর রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে, ভারী চমৎকার। আমার খেতে ইচ্ছে করছে। তিনি বলতেন, তোরা আমার পিঠে ঠাটাইয়া দুইখান দে। কেন আমার ওটা খাওয়ার ইচ্ছা হইল। আমি এই কাজটা করেছি। তোদের কাছে গোপন করেছি। বলি নাই। আমারে ঠাটাইয়া দুইখান দে। যাই (যা কিছু) আইতো মনে, তিনি স্বীকার করতেন।

এই, আমার মনে কামভাব জাগছে। আমারে ঠাটাইয়া আটটা বাড়ি দে। ওরা (ভক্তরা) দেখতাছে, ইনি দেখি সব বইলা ফেলাইতেছেন। ওরাও লগে লগে well-trained হইয়া যাইতেছে। ওদেরও লগে লগে ইচ্ছাগুলি আটকাইয়া যাইতেছে।

— এই আমার 'ঠাকুর' বনতে ইচ্ছা করতাছে। তোদের মাথায় হাত

বুলাইতে ইচ্ছা করতাছে। আমারে ঠাটাইয়া কয়েকখান দেতো। ওরাও ঠাটাইয়া মারতাছে।

'মনে আসছে', আর সেটাকে বাড়ি দিয়া, বাড়ি দিয়া সরাচ্ছেন। 'মনে আসা' আর ব্যবহার করা তো এক হল না। মনে আইসা পড়ছে, সেটাও যাতে না আসে, তারজন্য চেষ্টা করতাছেন। এছাড়া আর কিছুই করছেন না। Guard দেওয়া আছে তো। ব্যবহার করা তো দূরের কথা। মনে আইসা পড়ছে, সেটাই কাটাইয়া দেবার চেষ্টা করতাছেন। ব্যবহার তো অনেক পরের কথা। যা মনে আইসা পড়ছে, সেটাই তিনি স্বীকার করতাছেন।

এইভাবে ১২ জনে guard দিয়া গেল। ১২ জনে guard দিয়া দিয়া চলতে চলতে সাধকের যখন ৮৬ বছর বয়স হইল, মৃত্যুর দ্বারে যখন পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে কত যে রক্ষা করেছ, আমার কত যে উপকার করেছ, বলা যায় না।

তারা লাঠিগুলো সাধকের পায়ের কাছে দিল। তিনি বললেন, তোমরা আমার আদেশ পালন করেছ। তোমরাও শিখে নিলে। তোমরা যখন আদেশ পালন করেছ স্বচ্ছভাবে, তোমাদের পুণ্যি হল। তোমাদের ভাল হবে।

তোমরা আমার আদেশ পালন করেছ। তোমরাও শিখে নিলে। তোমরা যখন আদেশ পালন করেছ স্বচ্ছভাবে, তোমাদের পুণ্যি হল। তোমাদের ভাল হবে।

তিনি একখানি বই লিখেছেন। বই লেখার উদ্দেশ্যে এই লেখা নয়। কিভাবে জীবন তৈরী করতে হয়, জীবনগ্রন্থ, জীবনবেদ রচনা করতে হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এটি লেখা। আমার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলি, ঘাত প্রতিঘাতগুলি পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই লেখা। আমি পরিবেশনকারী মাত্র। আমি সাহিত্যিক নই, লেখক নই, ঋষিও নই।

সাধক বলছেন, আমি নাম কেনার জন্য লিখছি না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার দেশের জনগণ, আমার ভাইবোনেরা আজ বিপথে চলে যাচ্ছে। যাহা সত্য রয়েছে প্রকৃতির দরজায়, তাহার বাহক হিসাবেই এটি লেখা হচ্ছে। আমি লিখছি, এটা বলা অপরাধ। আমার দর্শন নয়, এটা প্রকৃতির দর্শন।

এই দেহযন্ত্রের মাধ্যমে সেটা বহির্গত হল। সুতরাং আমার জীবনে এই দেহযন্ত্রের মাধ্যমে আমি যা যা কিছু পেয়েছি, যা যা মনে হয়েছে, সব লিখে রেখেছি। এই যে হয়েছে, চেষ্টা করলে এই হয়, এটাই যথাসাধ্য আমি লিখে গেলাম। যদি এতে কারও উপকার হয়, কারও উপকারে লাগে, লাগবে। এতে আমার কোন কৃতিত্বও নাই, বাহাদুরিও নাই। কেমন কইরা নিজেকে guard দিয়া দিয়া চলেছেন, সেটাই লিখেছেন।

এই লেখাটা বিচক্ষণেরা পাঠ করে বলেছেন, বাঃ কি সুন্দর। নিজের কোনরকম কোন অহঙ্কার নাই, অহমিকা নাই; পবিত্র, স্বচ্ছ, শিশুমন। তিনি বলেছেন, আমার কোন বাহাদুরি নাই। আমার যে প্রশংসা করবে, সে সেটা ভুল করবে। যেইটা আমি দেখেছি রাস্তায় রাস্তায়, জীবনের খাতায় পাতায়, সেইটা আমি বলে গেলাম মাত্র। আমার এখানে কোন কৃতিত্ব নাই। প্রকৃতির দান দৃষ্টি, প্রকৃতির দান শ্রবণ, প্রকৃতির দান সব। প্রকৃতির দানের সাহায্যেই আমি এই কয়টি কথা দেহের মাধ্যমে লিখে গেলাম। 'আমি' বলে কোন সংজ্ঞা ব্যবহার করলে অপরাধ হবে আমার। আমার কোন কিছুই নেই এখানে। তাঁর (প্রকৃতির) দেওয়া বস্তু দিয়ে তাঁরই গুণকীর্তন করলাম।

আর এখানে লেখা কিরকম? আমি একজন 'দার্শনিক', ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। 'আমি দার্শনিক' এই কথা বললেই zero (জিরো) পেয়ে যাবে। 'আমার মতবাদ' এইকথা বললেই zero (জিরো) হয়ে যাবে। 'আমার মতবাদ' বলে কোন জিনিস নাই। ব্যাটা, কার মতবাদ দিবি রে? ছন্দে বন্দনায় কবিতায় সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

'আমার মতবাদ' এইকথা বললেই zero (জিরো) হয়ে যাবে। 'আমার মতবাদ' বলে কোন জিনিস নাই। ব্যাটা, কার মতবাদ দিবি রে? ছন্দে বন্দনায় কবিতায় সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

তুমি যা, কিছুই কর, যা কিছুই দিচ্ছ, শূন্যকে স্মরণ করে, শূন্যকে মনন করেই দাও। চারিদিকে এই পরিদৃশ্যমান জগতে এই রঙগুলি, বর্ণগুলি এইসব গাছ গাছড়া, পাতা তোমাকে আহ্বান করে ডেকে নিচ্ছে অনন্ত মহাশূন্যের পথে। ফল, ফুল, পাতা সব তোমাকে টেনে নিচ্ছে। টেনে নিয়ে তোমাকে কিন্তু অসীমের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কত রং লতায় পাতায়, কত

রং পাতাবাহারে, কত রঙের ছিটা কত রঙের কারুকার্য দেখা যায়। সব রঙ কিন্তু একজায়গার একটা রঙ। এরা একটাও তোমার জন্য অপেক্ষা করে না। এরা কিন্তু তোমাকে ডাকছে। ডাকতে ডাকতে আসছে, চল। আমরা কিন্তু সব গাছে পাতায় ফুলে ফলে, সর্ব অবস্থায় নীল আকাশের রঙকে বহন করে নিয়ে এসেছি। নীল আকাশের রঙই নাই। সেইটা যখন বহন কইরা আইছে, সব কিন্তু 'নাই' হইয়াই রইছে, 'নাই' হইয়াই আইছে। 'নাই' হইয়া যে রঙটা দেখছো নীল; নীল আকাশে দেখছো। এখানেও সে রঙটা দেখছো বিভিন্ন আকারে। বিভিন্ন colour-এ বিভিন্ন পাত্রে গিয়া বিভিন্ন রং ধরে বসে রয়েছে।

বুঝতে পারতেছ না, মনে হয় কঠিন হইয়া গেল গিয়া।

জলটা যদি লালপাত্রে রাখ, লাল দেখা যায় কি না? জলটা যদি নীল পাত্রে রাখ, নীল দেখা যায় কি না? দেখা যায় তো? জল তো নীল না। জলটা লাল? লাল পাত্রে রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে লাল। পাঁচটা গ্লাসের পাঁচ রকম রঙ। ঐ পাঁচটা গ্লাসে জল রাখলে, জলটা কি অতগুলো রঙের হয়ে গেল? জলের রঙ ঠিকই আছে। নীল আকাশের রঙ যেটা দেখতে পাচ্ছ, ঐটা তো আর রঙ না। ঐটা চিরকালই ঐরকম। সে (ঐ আকাশ) নিজে ভূগর্ভে (পৃথিবীতে) আসছে। পৃথিবীতে আসছে আকাশ। এসে মিশে আছে। মিশে থেকে বিভিন্ন রঙের বাহার দেখাচ্ছে। গাছ-গাছড়া, পাতায়, ফুলে ফলে এই যে বিভিন্ন রঙ দেখতে পাচ্ছ, এইসব রঙে রঙে মিশে আছে আকাশ। গাছ গাছড়া সব পাত্র। এইসব পাত্রে পাত্রে বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন চেহারা বাইরাইয়া যাচ্ছে। আকাশ বিভিন্ন পাত্রে এসে কোনটায় লাল দেখাইতেছে, কোনটায় সাদা দেখাইতেছে, আবার কোনটায় একটার মধ্যে পঞ্চাশরকমের রঙ দেখাচ্ছে। আবার কোনটায় green দেখাচ্ছে। এই যে রঙের বাহার দেখাচ্ছে, এই দেখানোটা কিন্তু পাত্রে এসে দেখাচ্ছে। এই যে রঙ, এই যে আমি (আকাশ) এই যে চেহারা সব কিন্তু পাত্র অনুযায়ী বাইরাইয়া যাইতেছে। আদতে কিন্তু এর একটা রংও ঐ আকাশের রঙ নয়। অথচ আকাশের কতগুলো রঙ দেখতে পাচ্ছ এই

নীল আকাশের রঙ যেটা দেখতে পাচ্ছ, ঐটা তো আর রঙ না। ঐটা চিরকালই ঐরকম।

পৃথিবীতে। কতগুলো রঙ তুমি দেখতে পাচ্ছ? আকাশ বলছে, নীল আকাশ বলছে আমি অগণিত রঙ অগণিত বিষয়বস্তুতে। রঙগুলি কি কি? প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে বিচারে, এগুলিই সব রঙের বাহার। এগুলিকেই রঙের বাহার বলছে। বুদ্ধি দেখ, বুদ্ধিতে আমি কিরকম। বিচারে গানে গীতে নাচে বলে বলীয়ান; সবের মধ্যে সবটার মধ্যেই নীল আকাশের রঙের বাহার চালাইতেছে। আর এই অগণিত রঙের বাহার চালিয়ে যে যাচ্ছে, তাতে মোহিত (মুগ্ধ) হইয়া তোমরা করতাছ কি? তোমরা এইটারেই মনে করছো আসল রঙ, আসল বুদ্ধি, আসল চিন্তা, আসল কাজ ইত্যাদি। এইটারেই আসল মনে কইরা তোমরা এর মধ্যেই ডুইবা থাকতাছ। আকাশ বলছে, এরজন্য কিন্তু তোমাদের পাঠানো হয় নাই। তোমাদের বহন করে নেওয়ার জন্য রঙ বেরঙের এত বস্তুর সমন্বয় করা হয়েছে। বাচ্চাদের শিশুদের খেলাইয়া খেলাইয়া যেমন নেয়, তোমাদেরও সেইভাবে আমি নিয়ে যাচ্ছি, টেনে নিচ্ছি। নিয়ে যাচ্ছি কোথায়? সীমাহীনের পথে। যেখানে পৌঁছালে যেই সুরটা যেই সাড়াটা একবার যখন ভিতরে আইসা উপস্থিত হবে, তখন দেখবা সব রঙ একরঙ হইয়া গেছে। এক রঙের থিকাই যে সব রঙ, তখন বুঝতে পারবা। সব রঙ হচ্ছে এক রঙ, একটাই রঙ। জল আট্‌কাইয়া রইছে আকাশে। যত রঙ সব বিভিন্নভাবে একই স্থানে পৌঁছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই বর্ণনাবিহীনের যে সুর সেই বর্ণবোধে, সেই বোধে যাতে সবাই গিয়া পৌঁছায়, তারজন্য এই ব্যবস্থা। প্রকৃতির এই ধারাপাতা একটু কঠিন। এটা আরেকদিন বলবো, একটু সহজ করে বলবো। ফট করে ধরতে অসুবিধা হবে। কিভাবে nature তোমাকে টেনে নিয়া যাচ্ছে, carry করছে, দেখবার মতন। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

আকাশ বলছে, নীল আকাশ বলচেষ আমি অগণিত রঙ অগণিত বিষয়বস্তুতে। রঙগুলি কি কি? প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে বিচারে, এগুলিই সব রঙের বাহার। এগুলিকেই রঙের বাহর বলছে।

বাচ্চাদের শিশুদের খেলাইয়া খেলাইয়া যেমন নেয়, তোমাদেরও সেইভাবে আমি নিয়ে যাচ্ছি, টেনে নিচ্ছি। নিয়ে যাচ্ছি কোথায়? সীমাহীনের পথে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

চলার পথে ঠিক হয়ে পথ চল

সুখচরধাম

২রা নভেম্বর, ১৯৮৭

স্বাবলম্বী হও। নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর। কোনদিকে তাকাবে না। কেউ কারও নিন্দা করতে আসলে বলবে, মাপ করেন। কারও নিন্দা শুনতে রাজী নই। কারও কোন কিছুই শুনতে চাই না। শুধু জানি, আমার জীবনের তরী ভাসিয়ে দিয়েছি। এই তরী যেন ঠিকমত পারে পৌঁছিয়ে যায়।

চলার পথে ঠিক হয়ে পথ চল। আর সময় নাই। ব্যাধিতে সব আক্রান্ত। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সব ঘিরে ধরেছে। যতদিন তোমাকে না নিয়ে যাবে, তারা তোমাকে ছাড়বে না। তারা নিযুক্ত। তারা সব প্রকৃতির প্রহরী। কখনও কর্ত্তব্যের ত্রুটি করবে না।

চলার পথে ঠিক হয়ে পথ চল। আর সময় নাই। ব্যাধিতে সব আক্রান্ত। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সব ঘিরে ধরেছে। যতদিন তোমাকে না নিয়ে যাবে, তারা তোমাকে ছাড়বে না। তারা নিযুক্ত। তারা সব প্রকৃতির প্রহরী। কখনও কর্ত্তব্যের ত্রুটি করবে না।

কিরকম হওয়া উচিত, আগে সেটা শিখে নে। রাগ, মেজাজ এইগুলি না সরাইলে কিছুই হবে না। এইগুলি ধইরা বইছোস্। ধইরাই বইছোস্। কিছুতেই ছাড়া পাইতেছে না। Blood sugar-এর মতন আইট্কা রইছে তোগো। আমি কতো চেঁচাইতেছি তগো লইগা। এর কথা ওর কথা ঝগড়ার সময় কইয়া দিলি। এতে পাপ বাড়ে, মনের কলুষতা বাড়ে। হিংসাটা বাড়ে, রাগটা বাড়ে। মান, অভিমান, রাগ, হিংসা, মেজাজ এইগুলি অন্য কামের লইগা। এগুলি nature দিছে অন্য কামের লইগা। এখন অফিসের লোক দিয়া যদি ঘর মোছাও, সেটা তো ঠিক না।

মান, অভিমান থাকবে না কেন? মানও থাকবে, রাগও থাকবে, মেজাজও থাকবে, অভিমানও থাকবে, সবই থাকবে। অন্য প্রয়োজনে থাকবে। থাকবে কি জন্য? আমি ঠাকুরের আদেশ পালন করতে পারতেছি না, ঠাকুর এত বলছেন। আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। দুঃখটা, মেজাজটা এইদিকে থাকবে। মেজাজটা এই নয়, 'ও' আমাকে এই কথা বললো? আমি ওর সাথে কথা বলবো না। 'ন', ঠাকুরের কাজ করে বইলা দেমাক হইয়া গেছে। 'স' লেখে বইলা দেমাক হইয়া গেছে। এই কথাগুলো অযথা বললে না? মান, অভিমান কর, যতই না হোক, মান অভিমান তো এইজন্য দেয় নাই। ঠাকুর এরে বাঁকুড়া যাইতে বললেন, আমি যাইতে পারলাম না। কাঁদতে শুরু করলো। এটা তো ঠিক না। একটা কারণ যদি হয়ে থাকে। নাও তো হতে পারে। আমি কখনও কাউকে direct কথা বলি না। অন্য কারণও হইতে পারে। আবার বললো, বাঁকুড়া যাওয়া নিয়া ঠাকুর আমারে শুনাইলেন। সেদিন যেমন 'গ' শুনাইল কথাটা, তার prestige নষ্ট করছি।

আমি ঠাকুরের আদেশ পালন করতে পারতেছি না, ঠাকুর এত বলছেন। আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।

কথার অর্থটা বুঝতে হয়। আমি কি বলি, সেইটা বুঝতে চেষ্টা করবা। নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়া আমাকে বিচার করলে ঠকবে। ব্যক্তিগত অর্থ দিয়া আমাকে বিচার করবে না। ব্যক্তিগত চিন্তা দিয়া আমাকে বিচার করবে না।

নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়া আমাকে বিচার করবে না। ব্যক্তিগত চিন্তা দিয়া আমাকে বিচার করবে না।

আমি 'র'র কথাটা তরে জানাইছি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তো বলি নাই। তুই চইটা উঠলি, ঠাকুর 'র'র কথাই বিশ্বাস করলেন। ওরা ঠাকুরের কাছে পুটুর পুটুর করার সময় পায় তো, ঠাকুর ওদের কথাই বিশ্বাস করেন।

আমি বললাম কি, আর তুই অর্থটা করলি কি? আমি তোকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছি। এইগুলি সাংঘাতিক জিনিস। আমি বললাম, 'র' তোর কথা এইটা বললো, ব্যাপারটা কি? আমি ঘটনাটা জানতে চাইছি। এতে কি এই প্রমাণ হয় যে, আমি 'র'র কথা বিশ্বাস করছি? কি বল? আমি কক্ষণো

এইভাবে কথা বলি না। কথাগুলো খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে হয়, আমি কী ধরণের কথা বলি। পাপগুলি কিভাবে করে? অযথা আমারে দোষারোপ করা, অযথা আমার সম্বন্ধে উক্তি করা, মনের মধ্যে অশান্তি আনা, এতে কিন্তু পাপের বোঝা বাড়ে। পাপ যে কমাইব (কমাবে) তারে যদি এখন ডাকাইত কও, তাইলে তো মহামুস্কিলের কথা। অর্থ যে দিতে আইছে, তারে যদি ডাকাইত কও; পরমার্থ যে দিতে আইছে, তার প্রতি যদি সন্দেহ আসে, সেই কাজটা করবে কি? যে প্রচুর অর্থ দিতে আইছে, তার সম্বন্ধে যদি বল, ডাকাইত আইছে, সে মনে করবে কি? আর পরমার্থ যে দিতে আইছে, তার সম্বন্ধে যদি সন্দেহ পোষণ কর, মনে দ্বন্দ্ব আন, যদি বল, আমারে ভুলাইতে আইছে, তাইলে কি হবে? আমি তরে (তোকে) ভুলাইতে আইছি? আমার ভুলানোর কোন্ ঠেকাটা? শেফা-গোই (শেফাদেরই) আমি ভুলাইয়া আসি নাই, বুঝাইয়া আইছি। আর তগো ভুলাইতে আইছি? ভুলানোর আমার স্বার্থটা কি? আজ বাদে কাল মইরা (মরে) যাবি। একেবারে টিলা পক্ষীর মতন কোটি কোটি জন্ম ছাইড়া আইছো। আমার স্বার্থটা কি? যেহেতু আমার কাছে আছ, আমার লক্ষ কোটি সন্তান সেইজন্য আমি দেখতাছি। সমুদ্রের পারে যে থাকে, সে সমুদ্রের জলটা পায়। আর দূরে যারা থাকে, তারা টিউবওয়েল থিকা জল পায়। টিউবওয়েলের জলে স্নান করে। সমুদ্রের কাছে যারা থাকে, সমুদ্রের জলেই স্নান করে। সমুদ্রের কাছে আছ বইলা মনে করি আমি, সমুদ্রে স্নানটা করতে পারতে। স্নানটা যদি না কর করলে না। গঙ্গায় চান করতে আগে যাইতো, এখন গঙ্গায় যাইব না। কাছে পাইয়াও যাইব না। সেইটা কখনও ভুল করবে না। কাজটা করতে ভুল করবে না। পৃথিবীতে যে যত কথা বলুক, মোক্ষম কথাই হল, ঠাকুর কি বলছেন। এইটা হইল প্রথম কথা। ঠাকুর কি বলেন? হাজার লোকে হাজার কথা বলুক

পাপগুলি কিভাবে করে? অযথা আমারে দোষারোপ করা, অযথা আমার সম্বন্ধে উক্তি করা, মনের মধ্যে অশান্তি আনা, এতে কিন্তু পাপের বোঝা বাড়ে।

সমুদ্রের কাছে যারা থাকে, সমুদ্রের জলেই স্নান করে। সমুদ্রের কাছে আছ বইলা মনে করি আমি, সমুদ্রে স্নানটা করতে পারতে।

পৃথিবীতে যে যত কথা বলুক, মোক্ষম কথাই হল, ঠাকুর কি বলছেন। এইটা হইল প্রথম কথা।

তোমাকে। তুমি খেয়াল রাখবে ঠাকুর কি বলেন? তারা ঠাকুরের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে পারে, সমালোচনা করতে পারে, যা খুশী তাই বলে বলুক। তুমি বলবে না।

'স' আসলে ঠাকুর খুশী হন, কথা বলেন। আমরা গেলে কথাও বলেন না, বসতেও বলেন না।

আমি খুশী হলে ভাগ্যের কথা, ভাগ্যের দরকার। কথা বলার প্রয়োজন আছে, তাই বলি। এসব কথা বলতে আসছো কেন?

ঠাকুর কি করেন, ঠাকুর কি বলেন, ঠাকুরের বিচার নিয়া আমার (ঠাকুরের) কাছে বলতে আসছো কেন? এতে অপরাধ আরও বেশী বাড়াইতাছ। আমি (ঠাকুর) কোন্ মনে কথা কইতাছি, তুমি তো বুঝতাছ না। আমি উত্তরে যামু, আমি দক্ষিণ দিকে রওনা দিছি।

আমি খুশী হলে ভাগ্যের কথা, ভাগ্যের দরকার। কথা বলার প্রয়োজন আছে, তাই বলি।

এ্যাঁ, ঠাকুর বললেন, উত্তরে যাবেন? গেলেন দক্ষিণে। আমাকে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, নিয়ে তো গেলেন না? কেমনে বিশ্বাস করবো? কেমনে নির্ভর করবো? কেমনে ধরবো?

'পৃথিবীটাতো গোল। আমি ঘুইরা তো উত্তরেই যাইতাছি গিয়া। উত্তরে আমি যাবই, উত্তরে আমার কাজ', ঠাকুর বললেন। আমি কোন্‌দিকে যাই, কোন্‌দিকে না যাই; আমার গতি কোন্‌দিকে, তুমি কি করে বুঝবে? সেটা তোমার বোঝার তো কথা নয়। লবণের পুতলা, মাপতে গেছিল সমুদ্ররে। নিজেই গইলা (গলে) গেল গিয়া।

কখন কি বলি, সেটা সবসময় মনে রাখবে। যতগুলি কথা যা যা বলি, তোমাদের benefit-এর জন্য, উপকারের জন্য, লাভের জন্য। সেজন্য তোমরা এর কথা, ওর কথা, তার কথা শুনে শুনে কোন মন্তব্য করবে না। আমি কারে দেইখা হাসলাম, কারে ধইরা বসাইলাম, কার সাথে কথা বললাম না,

কখন কি বলি, সেটা সবসময় মনে রাখবে। যতগুলি কথা যা যা বলি, তোমাদের benefit-এর জন্য, উপকারের জন্য, লাভের জন্য।

সেই নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানো উচিত না। কারে কোন্ ওষুধ দিয়া ভাল করবো, সেটা আমার ব্যাপার। তোমারে দিলাম কুইনাইন, অরে দিলাম সিরাপ। হ্যাঁ, ঠাকুর অরে (ওকে) সিরাপ দিলেন, আমারে তিতা কুইনাইন। কারে কোন্ ওষুধ দেব, কারে ধইরা বসাইতে হইব, কারে সরাইতে হইব, কারে কাছে রাখতে হইব, তুমি বুঝবা কি কইরা? কারে ডাকলাম না, কার লগে কথা কইলাম, বিচার করতে যেও না। এটা বিচারের মধ্যে পড়ে না। পাপের মধ্যে তোমরা ডুইবা যাইতাছ। আমার তো কোন অসুবিধা নাই। **সবসময়ের জন্য স্মরণ রাখবা, ঐখানে গিয়া যেন সব একত্র হইতে পার। সব গিয়া যেন একসুরে থাকতে পার**। ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন, এগুলো সব শুনতে পারবে। এত সোজা করে ঠাকুর বলছেন, তাও যদি শুনতে না পার, এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে?

ওরা (বিদেহীরা) আর কি বুঝাবে? ওরা বলবে, 'আমরা গিয়া ছ্যাঁচা খাইয়া আইছি। আমরা ভুল কইরা গেছি। এই ভুলটা তোরা করিস না।' ওরা থাকলে চিৎকার কইরা কইতো। আমার মা থাকলে কইতো, 'দেখরে স, দেখরে ক, এই ভুল তোরা করিস্ না। মৃত্যু যখন আছে, এই ছাতা মাথা নিয়া মাথা ঘামাইস না।'

আমার মা থাকলে কইতো, 'দেখরে স, দেখরে ক, এই ভুল তোরা করিস্ না। মৃত্যু যখন আছে, এই ছাতা মাথা নিয়া মাথা ঘামাইস না।'

ঠাকুর যা যা বলবেন, সেইটা শুনে সেইমত তোমরা চলবে। দ্বিতীয়বার তাকাইয়া বলতে যাবে না, 'কেন'? একটা বাচ্চা শিশু যখন থাকে, তার কোন্ অধিকার থাকে কিছু বলার? কান্না ছাড়া? বাচ্চাকে যেমনি মা রাখে, তেমনি থাকে। ঠিক সেইভাবে তোমরা থাকবা। কোন অভিমান নিবা না। মনে করবা না যে, আমারে শুনাইতেছে, তারে শুনাইতেছে। প্রত্যেকের বেলাই এই কথাগুলি শুনতে (মেনে চলতে) হবে। আমার কি প্রয়োজন আছে কথা শুনাবার? সবসময় মনে রাখবা, ঠাকুরের কি প্রয়োজন আমারে শুনাবার?

শুধু হেনা, শেফা, জয়ন্তীর মত একান্ত অনুগত হও; কি নিষ্ঠা ওদের আমার আদেশ পালনে। তিনটা diamond ফেইলা দিয়া আসছি আমি। যদি আসতো এখানে, দেখলে বুঝতে পারতি। তোরাই বলতি, তুমি এদের ফেলে দিয়া আসছো? আমরা তো নগণ্য।

অরে (ওকে) ভাল বইলা, তরে (তোকে) মন্দ বলুম, আমার কি প্রয়োজন আছে? কোন প্রয়োজন আমার নাই। শুধু হেনা, শেফা, জয়ন্তীর মত একান্ত অনুগত হও; কি নিষ্ঠা ওদের আমার আদেশ পালনে। তিনটা diamond ফেইলা দিয়া আসছি আমি। যদি আসতো এখানে, দেখলে বুঝতে পারতি। তোরাই বলতি, তুমি এদের ফেলে দিয়া আসছো? আমরা তো নগণ্য। কি করে ফেলে দিয়ে এসেছো এদের? কোন প্রতিবাদ নাই। একদিনের জন্যও আমার কোন কথায় প্রতিবাদ করে নাই। যা বলেছি, একেবারে অভ্রান্ত সত্য।

হেনাকে পরীক্ষা করেছি। আমার সম্বন্ধে আজে বাজে কথা বলার জন্য লোক পাঠাইয়া দিছি। সে আমার সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করছে, 'একটা গরীব খাওয়া জোটে না, কিছু নাই। কেন আপনি ওর চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন? শয়তান, ভন্ড।

হেনা বলছে, আর কিছু বলবে? চলে যাও। আমি না ডাকলে আর কোনদিন আসবে না। যাঁর কথা বলেছো, তাঁর সম্বন্ধে আরও বেশী গুরুত্ব আমার হ'ল। তুমি কতটা হিংসুক, কতটা পরশ্রীকাতর আমি বুঝে নিলাম। তাঁর বিরুদ্ধে যত বলবে, তাঁর মূল্য আমার কাছে তত বাড়বে।

পরে হেনাকে বলে পাঠালাম, 'একে আমি পাঠিয়েছিলাম তোমার মন দেখার জন্য, ওকে বুঝাবার জন্য। ও বুঝলো, কিছুতেই তুমি পরিবর্তন হবে না।'

হেনা বললো, 'ধন্যবাদ। তুমি যে ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেছ, সেজন্য তোমাকে নমস্কার জানাচ্ছি।' দেখ, কি সুন্দর।

কখন কারে আমি কি অবস্থায় পাঠাই, কোন্ বুঝে পাঠাই, কার কথা বলে আমি কাকে ঠিক করি, কোন কথায় কোন দিকে মন দেবে না। যা আদেশ, মোক্ষম আদেশ। আর দ্বিতীয়বার মাথা তুইলা দাঁড়াইবা না। বাচ্চা শিশু মাথা তুইলা দাঁড়ায় না। বুকের কাছেই মাথা রাখে। শিশুর মত নির্ভরতায় থাক। তবেই সত্যিকারের খোঁজ পাবে। তা না হইলে মরণটা

বাচ্চা শিশু মাথা তুইলা দাঁড়ায় না। বুকের কাছেই মাথা রাখে। শিশুর মত নির্ভরতায় থাক। তবেই সত্যিকারের খোঁজ পাবে। তা না হইলে মরণটা যখন আছে, কেউ কারও বন্ধু নাই। সবাই সবাইরে ফেলাইয়া দিয়া, ছাইড়া দিয়া চইলা যায়।

যখন আছে, কেউ কারও বন্ধু নাই। সবাই সবাইরে ফেলাইয়া দিয়া, ছাইড়া দিয়া চইলা যায়। ছেলে চইলা যায় বাপরে ছাইড়া দিয়া। আমার ভাইয়ে চইলা গেল মায়রে ছাইড়া দিয়া। বাবায় চইলা গেল মায়রে ছাইড়া দিয়া। সম্পর্ক দেখতাছ। যে যতটুকু কথা বলে, ততটুকুই সম্পর্ক। এছাড়া সম্পর্ক থাকবে না। চক্ষের সামনে দেখতাছ মৃত্যু আছে, সেখানে এই কথাগুলো কোত্থেকে আসে তোমাদের? কি করে মনের মধ্যে এই আবিলতাগুলো আসে? স্বচ্ছভাবে ঠাকুরের কাছে আছ, সুন্দরভাবে থাক। আমি বলি, আমি অনেকবার করে বলি। কতটা গুরুত্ব আছে আমার কথার তোমরাই জান। আমি কিছু বললেই মনে করো না আমাকে কথা শোনাচ্ছে। আমার কি স্বার্থ আছে কথা শোনাবার? শোনাবার জন্য আমি বলি না। কাউকে আঘাত দেবার জন্য আমি বলি না। এটা একটা মস্ত ভুল ধারণা তোমাদের। আমি যা কিছু বলি, তোমাদের ভালর জন্যই বলি। যদি কিছু বলি সবার সামনে, এটা একটা treatment. তুমি বলবে, 'ঠাকুর, আমি এইভাবে বলেছি। মনের থেকে বলি নাই। আমি সেই চিন্তা করে করি নাই। ঠাকুর আমি যেন আর না করি। আমি আর করবো না'। আরেকজন সেইটা শুইনা গেল, 'ও' সেই চিন্তা কইরা করে নাই। 'ও' আর করবে না। পবিত্র চিন্তা কইরা কাজ কইরা যাও। এই পথগুলি তৈরি না করলে কি কইরা যাবে? সিঁড়ি ডিঙাইয়া যদি চলতে হয়, যদি দুই সিঁড়ি লাফ দিয়া চলো, তবে তো বিপদ হবেই। হাত-পা ভাইঙ্গা যাবেই। তবে তো রক্ষা করতে পারবে না। সবদিকে balance রাইখা চলতে হবে। Balance রাইখা তোমাদের চলতে হবে, মনে রেখো, প্রতিটি কাজে প্রত্যেকের সাথে। একটা কথা প্রত্যেকে মনে রাখবে, কেউ কারও সাথে সম্পর্কে নাই। যতটুকু আছে প্ল্যাটফর্মের সম্পর্ক। প্ল্যাটফর্মে ভালবাসা হয় না? পাঁচজনে আইল, দেখা হইল। তারপর যার যার গাড়ীতে উইঠা টা টা

পবিত্র চিন্তা কইরা কাজ কইরা যাও। এই পথগুলি তৈরি না করলে কি কইরা যাবে? সিঁড়ি ডিঙাইয়া যদি চলতে হয়, যদি দুই সিঁড়ি লাফ দিয়া চলো, তবে তো বিপদ হবেই। হাত-পা ভাইঙ্গা যাবেই।

আমার এখন গাড়ী ছাইড়া দেবে। আমার তাড়াতাড়ি বোঁচকা বাঁধতে হবে। আমার কাজটুকু শেষ করতে হবে।

করলো। এটা হইল ঠিক প্ল্যাটফর্মের ভালবাসা। কারও কথায় কান দিবা না। এইটুকু ঠিক রাইখা কাজ কইরা যাইবা। এইটা এই কইছে, ঐটা ঐ কইছে আমার এগুলি ধরারই দরকার নাই। আমার এখন গাড়ী ছাইড়া দেবে। আমার তাড়াতাড়ি বোঁচকা বাঁধতে হবে। আমার কাজটুকু শেষ করতে হবে।

মনে থাকবে তো? মনে থাকবে তো তোমাদের? মনে রাইখা দিবা প্রত্যেকটি কথা। আবার এমন একটা মেজাজ, এমন একটা খটাখটি হইল আমার লগে যে, তোমরাই বললা, 'হ এইগুলি হবে? যা হয় হোক। আমি ওদিকে যাব না। আমি এগুলি মানি না। যা ইচ্ছা তাই হোক। আমি ঐগুলি মানি না। আমার ঐগুলি দরকার নাই।' বাঃ সব মুইছা ফেলাইল। এতদিনের পরিশ্রম আমার, সব বৃথা গেল।

মাথা গরম করবা না। মৃত্যু চিন্তা করবা না। সুইসাইডের (suicide) চিন্তা করবা না। আমি তাড়াতাড়ি চইলা যামু, এই কথা চিন্তা করবা না। প্রকৃতি তোমাকে নিয়ে যাবে যখন, তোমার তো এই চিন্তা করার দরকার নাই। খোদার ওপর খোদকারি করবে না। করবে না? বল? বল? স্বীকার কর?

যাইতে যখন হবেই, তোমার ওগুলি চিন্তার ঠেকাটা কি? গাড়ীটা চলছে। তুমি কি বলবে, ষ্টেশনে না নাইমা লাফ দিয়া নামি? বল, suicide-এর চিন্তা করবো না। যেখানে যেতে হবেই, সেখানে চিন্তা কইরা লাভটা কি অযথা? কথাটা বুঝতে পেরেছ? বল, suicide-এর চিন্তা করবো না। বল? বল তোমরা?

— করবো না।

— ব্যাস্। এই তো পরিষ্কার হইয়া গেল।

আমি যাব যখন জানি, যখন তোমার নেওয়ার আমাকে নিয়ে নেবে। আমি যাব যখন জানতে পারলাম, সময়মত তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। এইভাবে চিন্তা করে চলবে। কোন মা কোন সন্তানকে মেরে ফেলে দেয়?

বিড়াল তার একটা বাচ্চাকে মেরে ফেলে দিয়েছে।

কেন তুমি নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলে দিলে? প্রশ্ন করলে সে কি উত্তর দেবে?

সে (বিড়াল) বলে, আমার দুধ হইছে পাঁচটা। আমার বাচ্চা হইছে ছয়টা। একটা বাচ্চার জন্য অন্য পাঁচটা বাচ্চা দুধ খাইতে পাইতেছে না। তার ফলে পাঁচটা বাচ্চাই মারা যাবে। পাঁচটাকে বাঁচাবার জন্য একটা বাচ্চাকে মেরে ফেলা হলো। নিষ্ঠুরের মতন ব্যবহার করতে হল। তাছাড়া আর উপায় ছিল না। বাচ্চারা বড় হয়ে যাচ্ছে। এদেরে আমি রক্ষা করতে পারবো না। আর যা করেছি, তাতে আমি ঐ পাঁচটা বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারবো। পাঁচটা বাচ্চার মা (বিড়াল) বলছে। শরীরের কোন অঙ্গ বাদ যায় না? হাত ফেলাইয়া দিয়া আসনা? কখন কোন্ কাজ করি সব কি কৈফিয়ৎ দিয়া করা যায়, নিজের জনকে? সেইজন্য সন্তান। সেইজন্য দীক্ষা। নিজের সন্তানকে বা বাচ্চাকে কৈফিয়ৎ দিয়া মা কখনও কাজ করে না।

কখন কোন্ কাজ করি সব কি কৈফিয়ৎ দিয়া করা যায়, নিজের জনকে? সেইজন্য সন্তান। সেইজন্য দীক্ষা। নিজের সন্তানকে বা বাচ্চাকে কৈফিয়ৎ দিয়া মা কখনও কাজ করে না।

মানুষ তার হুঁশ নাই। সে ইচ্ছাকৃত করে নাই। তবু ত্রুটি থাকবে। তবে সেটা negligible অবহেলার বস্তু। এই ত্রুটিটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তার (বিড়ালের) উদ্দেশ্যটা মহৎ। সবটাই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটা আগে দেখে। একটা খুনের case চললে প্রথমেই দেখে খুন করার উদ্দেশ্য কি? Motive-টা কি? উপযুক্ত প্রমাণ না দিলে খালাস। জজ (বিচারক) বলছে, আপনি যে বলছেন, খুন করেছে, তার উপযুক্ত প্রমাণ দিন। তবেই তার ফাঁস হবে। নাহলে খালাস। প্রমাণ দেখাতে পারতেছে না। আসামী বলছে, আমি খুন করি নাই। কি উদ্দেশ্যে খুন করবে? প্রমাণ না দেখাতে পারলে খালাস।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব আলোচনা ও ক্লাস করার সময়ে সুখচরধামের আবাসিকবৃন্দ ও বহিরাগত অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। তত্ত্ব বুঝানোর সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর নাম ধরে ধরে অনেক কথা বলতেন। প্রয়োজনে সেই নামগুলি বাদ দিয়ে 'ক', 'খ', 'গ' ইত্যাদি অক্ষরগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মৃত্যু যখন আছে তখন পাথেয় দরকার

সুখচরধাম
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

আমি দেখবো, কে কতবার রাগ করেছে। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে, কি কি বিষয় নিয়ে রাগ করেছে। এটা প্রত্যেকের চোখে পড়বে। প্রত্যেকে প্রত্যেকেরটা দেখবে। যার রাগ যত কম থাকবে, list-এ নাম কম উঠবে, সে ততবেশী কাজ করবে। সংসারে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ভুল বোঝাবুঝিটাই মানুষকে একেবারে বিভ্রান্ত করছে। ভুল বুঝাতেই আর টিকে থাকতে দিচ্ছে না। ভুল বুঝাবুঝিতেই মানুষকে বড় অশান্তি দিচ্ছে।

তোমাদের মধ্যে কেউ ভুল বুঝাবুঝিতে যাবে না। না জেনে না শুনে কেউ কোন মন্তব্য করবে না। আগে বুঝে নেবে, জেনে নেবে। যার বিষয় হোক, স্বামী হোক, স্ত্রী হোক, পুত্র হোক, বন্ধু হোক, ভাই হোক, মা হোক, বাবা হোক সংগঠনের যে কেউ হোক, এমনকি গুরু হোক যেই হোক প্রত্যেকের অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে শুনবে। সেখানে কোন পক্ষপাতিত্ব চলবে না। তোমার কাছে একজন আইয়া কইল এক কথা অর (ওর) কথা তুমি বিশ্বাস কর বইলা শুইনা যাইবা, তা না। নিরপেক্ষভাবে শত্রু এবং মিত্র বলে যাকে মনে করো, দুই পক্ষের কথা সুন্দরভাবে শুনবে, ঠিক আছে?

স্বামী হোক, স্ত্রী হোক, পুত্র হোক, বন্ধু হোক, ভাই হোক, মা হোক, বাবা হোক সংগঠনের যে কেউ হোক, এমনকি গুরু হোক যেই হোক প্রত্যেকের অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে শুনবে।

যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, শুনতে আর পারলে না। যেটা বললাম, এটারও প্রয়োজন আছে। এতে বড্ড অশান্তি হয়। কারণ যারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা বিভ্রান্ত হবেই। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

সবসময় সহজ সরল মন নিয়ে চলবে। প্রত্যেকে সহজ সরল মন নিয়ে চলবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধা দেখবে।

হুঁচোটের মাঝে চলতে হয়। স্ত্রী বিভ্রান্ত করছে, ছেলে বিভ্রান্ত করছে, মা বিভ্রান্ত করছে, ঘর বিভ্রান্ত করছে, সংগঠনের কর্মীরা বিভ্রান্ত করছে, এই করছে, সেই করছে; খাওয়া নিয়া, পরা নিয়া, থাকা নিয়া চলতে থাকে শুধু। এসবের উপরে কোন ভিত্তি কেউ করবা না। তুই লাফাইয়া গেলি। তোর আন্তরিকতার, sincerity-র অভাব নাই। আরেকজন এতে অখুশী হল। হোক। তুমি তাতে কিছু মনে করবে না। তুমি তোমার সহজ সরল মনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? সবসময় সহজ সরল মন নিয়ে চলবে। প্রত্যেকে সহজ সরল মন নিয়ে চলবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধা দেখবে। কথা শোনানো খুব সহজ। এই জগৎ সংসারে একটু অসুবিধা হলেই একে অন্যকে কথা শুনিয়ে দেয়। একান্নবর্তী সংসারে খটাখটি লেগেই থাকে। যেমন ধর এই তো গেছিলাম খাইতে দিল না। আরেকজনরে তো খাওয়াইয়া দিল। আমাদের বসাইয়া রাখলো। সাধারণ ব্যাপারটার ওপর অন্য মাত্রা যোগ হইল। প্রথমে যাদের বসাইছে, যে ভাতটা ছিল, ওদের তা দিয়া দিছে। পরে ভাতটা বসাইছে, তাই তোমারে দিতে পারে নাই। এই সাধারণ ব্যাপারটায় তাদের কোন প্রয়োজন নাই তোমার সঙ্গে রাগারাগি করার। কিন্তু আবার এও আছে, তোমার ওপরে যদি আক্রোশ থাকে, তোমারে একটুখানি জব্দ করলো, তাও হতে পারে। সুতরাং কি হতে পারে একটা ঘটনা যখন হতে পারে হয়, সেই ঘটনার ওপরে মনোনিবেশ করবে না। মন্তব্য করতে পারবে না। যদি না হয়ে থাকে। তুমি মনে করলে, আমি আসলাম। আমাকে দিল না। 'ও' (অন্য একজন) খেয়ে গেল। এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। সেই জায়গায় কোনরকম সিদ্ধান্তে আসবে না। অযথা মন খারাপ করবে না। উঠেও যাবে না। 'আমি এখানে বসলাম। ভাতটা হলে আমাকে জানাবে,' এটাই বলতে হবে তোমাকে। সেখানে 'আচ্ছা, আমি আর এখন খাব না। আমি মুড়ি খেয়ে চলে যাচ্ছি।' এমনভাবে কোন কথা বলবে না, যাতে ওরা বুঝতে পারে, 'দেখ, আমাকে (আমাদের) খুঁচিয়ে কথা বলে গেল।'

আর প্রতিটি সংসারে প্রত্যেকের কাজের দাম দেবে। প্রত্যেক কাজের

আমি অন্যের দুর্ব্যবহার ভুলে যাই। জীবনে ছোট বয়স থেকে মানুষের ভারটাই নিলাম, আঘাতটাই নিলাম। ভালবেসে অন্যের আঘাতটা লাঘব করা উচিত।

মর্যাদা দিবা। আমি কাজের মূল্য দেই প্রত্যেকের। প্রত্যেকের কাজের মূল্য দেওয়া শিখবা। কাজ করবা। আমি অন্যের দুর্ব্যবহার ভুলে যাই। জীবনে ছোট বয়স থেকে মানুষের ভারটাই নিলাম, আঘাতটাই নিলাম। ভালবেসে অন্যের আঘাতটা লাঘব করা উচিত। চৈত্র মাসে এইমাত্র আসছি সদয় নিয়া (দোকানের জিনিসপত্র নিয়া)। একমাইল, দেড়মাইল দূরে দোকান, বাজার। আসা মাত্র আবার আমারে একমাইল দূরে আরেকটা জিনিস আনতে পাঠাইয়া দিছে। আমি খুশী চিত্তে গেলাম গিয়া। আমি রাগ করি নাই। রাগারাগির মধ্যেই নাই। বলতে গেলেই মেজাজ। সময় নষ্ট। তর্কে তর্ক বাড়ে। মন কষাকষিতে মন কষাকষি বাড়ে। আর এতে মন কলুষিত হয়ে যায়। তুমি চিন্তা করলা বইয়া বইয়া, 'আমি এত করলাম, এত-কাল করলাম। আমারে এরকম ভাবলো, এরকম চিন্তা করলো।'

Ultimate দেখা গেল, কোনটার মধ্যেই নাই। এদিকে তুমি সাতে পাঁচে তিনে দুইয়ে মিশাইয়া একখান স্থির করলা। সুতরাং কোন ভাবাভাবির মধ্যে যাইবা না। কোন কথাই বলবা না। **যতক্ষণ ঘাড়ে ধইরা বাইর কইরা না দিব, ততক্ষণ কোন কিছুর মধ্যেই যাইবা না। ঐটাই হইল শেষ কথা।** যতই ভুরু ঘুচাইয়া যাউক, যতই ভুরু ঘুচাইয়া থাকুক, তুমি স্বচ্ছ মনে থাকবা। আমার পবিত্র চিন্তায়, আমার পবিত্র কর্মে তারা পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে। তাই হয়েছে। তাই আমার বড় ভাইরা, মামাতো ভাইরা সবাই এসেছে। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের পায়ে পড়ে, হয় কখনও? তারা আমারে মারছে, শাসন করছে। হ্যাজাকের একটা ম্যান্টল্ পইরা গেছে পরিষ্কার করতে গিয়া। আমার তখন ১০/১১ বছর বয়স। আমি সব কাজ নিপুণভাবে করি বইলা (সেজন্য) আমার এক মামাতো দাদা আমারে হ্যাজাক পরিষ্কার করতে দিছে। আমি এমুন ওমুন করতাছি। ঐটা (গত বছরের ম্যান্টল্টা) খুইলা পইরা গেছে। মামাতো দাদা আইয়া না করছে কি, এমুন

যতই ভুরু ঘুচাইয়া যাউক, যতই ভুরু ঘুচাইয়া থাকুক, তুমি স্বচ্ছ মনে থাকবা। আমার পবিত্র চিন্তায়, আমার পবিত্র কর্মে তারা পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে। তাই হয়েছে।

একখান দিল না আমারে, আমি একেবারে বেঁকা হইয়া বইয়া রইলাম। আমি নিজের অপরাধ বইলাই মনে করতাছি। আমি কইলাম, দাদা আমি আস্তে আস্তেই করছি। আমি বুঝতে পারি নাই। আমি আর কোন কথা বলি নাই। আবার কাজ করতাছি, মুছতাছি। শেষে দাদা আইয়া (এসে) আমারে আদর করতাছে। আমি তো কোন নালিশ করি নাই। দাদায় মারছে, দোষ করছি। দাদা চোখের জল ফেলাইয়া দিছে, অন্য ভাই হইলে চটতো, রাগ করতো। পিসীর কাছে নালিশ করতো। আমি মারছি বইলা তুই একটুও রাগ করলি না? কাউকে বললিও না?

— কেন বলবো? আপনি তো না জেনে আমাকে মারেননি। আপনি তো বুঝেই আমাকে মেরেছেন।

— এটা গতবছরের। নষ্ট হয়ে গেছে। তুই আমার উপর রাগ করিস্ নাই তো?

— না, আমি রাগ করি নাই।

কোথায়? এই তো হইয়া গেল ঘটনা। সেই দাদা আইসা পায়ে ধরছে। পায়ে ধইরা বইসা রইছে। আসবে না কেন? মায়ের থিকা ১ বছরের ছোট। আমার থিকা ১৭/১৮ বছরের বড়। সেই দাদা তো পায়ে ধইরা বইসা রইছে। আমি পায়ে ধরাটার কথা বলছি না। পায়ে ধরাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। তাকে আমি প্রণাম করি। কিন্তু সেই হাত তো আইসা পড়লো। আর কতবড় আমাকে মনে করলে পায়ে ধরতে পারে, বড় ভাই হইয়া? এটা হয় কখনও? ছোট ভাইকে বড় করার জন্য বড় ভাই আইসা ছোট ভাইয়ের পায়ে পড়ে, এটা শুনেছ কখনও? এতো অন্যরকম ভাই, মামাতো ভাই। কথাটা বুইঝা নিও। এটা হয় কখনও? ইতিহাসে আছে? ভুলে যেও না।

আর কতবড় আমাকে মনে করলে পায়ে ধরতে পারে, বড় ভাই হইয়া? এটা হয় কখনও? ছোট ভাইকে বড় করার জন্য বড় ভাই আইসা ছোট ভাইয়ের পায়ে পড়ে, এটা শুনেছ কখনও? এতো অন্যরকম ভাই, মামাতো ভাই। কথাটা বুইঝা নিও। এটা হয় কখনও? ইতিহাসে আছে? ভুলে যেও না।

তোমাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি, মনের মধ্যে কোন আলাপ আলোচনা, আজে বাজে কথা রাখবে না এবং নিজেদের মধ্যে অর (ওর) নিন্দা, অর

সমালোচনা, তার সমালোচনা কেউ করবে না। যতটুকু সময় তোমাদের আছে, **মৃত্যু যখন আছে, পাথেয় দরকার।** যে নাম তোমাদের আমি দিয়েছি, তাতেই যথেষ্ট। সেই নাম করে কাটাবে। বসে বসে সেই নাম করবে। কাজ করবে। ঘরের কাজ নিপুণভাবে করবে। পবিত্রভাবে করবে। একটা জিনিস বিশেষভাবে মনে রাখবে। যদি মনে কর, (যেকোন সংসারে) ঝোলের মধ্যে বা মিষ্টির মধ্যে বা কোনকিছু খাবারের মধ্যে, রান্নার মধ্যে টিকটিকি পড়ে রয়েছে বা বিড়ালে খেয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবে। গোপন করবে না। ৫ সের দুধ হোক, ১০ সের দুধ হোক, ফেলে দেবে। কেউ গোপন করবে না। আমার জন্য হইছে। না কইয়া চুপ কইরা রইলা। তা করবা না। একটার জন্য ৫০ জন লোক মারা যাইতে পারে। একটা বকা খাও, ক্ষতি নাই। ফেলে দেবে। এই জিনিস কেউ লুকাবে না। নিজেদের ভয়ে ঐসব জিনিস কেউ লুকাবে না। পরিষ্কার বলে দেবে। তাতে যদি তোমাদের কেউ বকে, তারজন্য আমি দায়ী। এরজন্য তোমাদের কেউ বকলে আমি তাকে punishment দেব।

নিজেদের মধ্যে 'দেখ, 'ও' ঐরকম কইছে, সে এইরকম কইছে' এইসব বলে বলে এইগুলোতে ইন্ধন জোগাবে না। আর **কারও বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা সমালোচনা করবে না। আমি নিষিদ্ধ করে দিলাম। তবেই সব সংসার পবিত্র থাকবে। সকলের মধ্যে ভালবাসা থাকবে। সংসারটা (জগৎ সংসার) সুন্দর থাকবে, বলে দিলাম। কাউকে হিংসা করবে না। এখন নোট করা হলো। পরে সবাইকে ডেকে নির্দেশ হিসাবে প্রতিটি সংগঠনের সবাইকে জানানো হবে। এটা ভাল হলো। এই advice-টা সবাইকে দিয়ে দেওয়া হলো।**

এখন নোট করা হলো। পরে সবাইকে ডেকে নির্দেশ হিসাবে প্রতিটি সংগঠনের সবাইকে জানানো হবে।

অযথা কারও ভুল বোঝাবুঝিতে যাবে না। অযথা ধারণা করবে না। অযথা কোন কিছু করবে না। 'স' মনে কর, কোন ছেলের দিকে তাকালো, ওর তাকানো অভ্যাস আছে ঠিকই, কিন্তু মনটা যা দেখলাম

সময় চইলা যাইতেছে। আর বেশীদিন থাকবো না আমি এখানে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবো।

খারাপের দিকে না। এখন তুই যদি 'স'-রে গালাগালি দিতে শুরু করিস্, 'ক্যান্ তাকালি? ক্যান্ করলি?' তখন জিনিসটা সুন্দর হবে না। অর 'স' habit হইল, তাকাইয়া রইল, হেঁ হেঁ কইরা হাসলো। এইটা একটা অভ্যাস। এতে ভালবাসা আসে না। প্রতিটি সন্তানই আমার পরম স্নেহের। 'খ'-ও আমার পরম স্নেহের। আমার এক ভাইর বেটা আমার কাছে থাকে। অর ঠাকুর্দা ও আমার বাবা, আপন সহোদর ভাই। চিন্তা কইরা দেইখো। 'ও' আমার এক রক্তের। আমার ভাইর বেটা, সে বাড়ীর নর্দমা থিকা আরম্ভ কইরা ঘর মোছা, ঘর পরিষ্কার করা, টিনের সব ময়লা ফেলানো সব করতাছে। এতে আমি গৌরব বোধ করছি। আমি বলি, এটাই আমাদের বংশের ধারা। আমার বাড়ীর ছেলে, আমার রক্তের ধারা। তাকে বসিয়ে রাখা হয় নাই। নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর সব কাজ করতাছে। এটাই সম্মান। একত্র হইয়া কাজকর্ম করবি। কারও উপরে রাগ কইরা যদি কেউ না খাইয়া থাক তবে তো মার খাবে। কারুর উপরে রাগ কইরা না খাইয়া রইলে। কার উপরে রাগ করলে? মার খাবে তুমি। তারা মার খাইব না। তুমি বলে দেবে, আমি এই time-এ আসবো। আমারে তাড়াতাড়ি দিও। একটু গুছাইয়া টুছাইয়া দিও। সেটাই নিয়ম। এই নিয়া আর সময় নষ্ট করবা না। সময় চইলা যাইতেছে। **আর বেশীদিন থাকবো না আমি এখানে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবো।**

প্রত্যেককে আমি এইটা বিশেষ কইরা জানাইয়া দিলাম। না জাইনা (জেনে) ভুল বুঝবা না। আর যে যা খুশী কথা বলুক, খোঁচাইয়া বলুক, মন দিবা না। তুমি মনে করলা, 'আমারে খোঁচাইয়া কথা কইছে। আমি বুঝলাম।' Fault যদি না হয়। তাইলে অযথা তুমি মন খারাপ করলা। তুমি তার উপরে রাগটা ছাড়তে পার। তাতে সংশোধন হবে না। কিন্তু **সংশোধনের যন্ত্রটা আমার কাছে আছে। ফেলাইয়া রাখছি একটা যন্ত্র। যার যার মেশিনে পইরা সইরা যাইব গিয়া।** ঐ যে আগুনটা

তাতে সংশোধন হবে না। কিন্তু সংশোধনের যন্ত্রটা আমার কাছে আছে। ফেলাইয়া রাখছি একটা যন্ত্র। যার যার মেশিনে পইরা সইরা যাইব গিয়া। ঐ যে আগুনটা পইরা থাকে, শ্যামাপোকা যেগুলিরে কয়, সবগুলি আগুনে পইরা মরে। অরা (শ্যামাপোকা) নিজেরাই আগুনে পইরা মরে। কাউরে ভাবতে হবে না। কিভাবে আমার বিচার হয়, চেহারায় বুঝবা না।

পইরা থাকে, শ্যামাপোকা যেগুলিরে কয়, সবগুলি আগুনে পইরা মরে। অরা (শ্যামাপোকা) নিজেরাই আগুনে পইরা মরে। কাউরে ভাবতে হবে না। কিভাবে আমার বিচার হয়, চেহারায় বুঝবা না। মনে কর, তর (তোর) বিষয় আমারে কেউ বলতাছে। তুই ফট কইরা শুনলি। 'ও' চুপ মাইরা গেল গিয়া। তুই বললি, 'হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে কি যেন বলছিল। তুই আইয়া (এসে) আমারে চার্জ করলি। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে?

আমি বললাম, সেটা তো তোমার জানার কথা নয়। কি বলছে, না বলছে, সে তো আমার কাছে নিরিবিলি বলছে। সেটা যদি আমি বলেই দিলাম, তাইলে আর 'নিরিবিলি' রইল কোথায়? নিরিবিলি তো রইল না। 'ও' যেটা বলছে, আমি সেটা শুনলাম। শুইনা তো আমি সেটার উপরে মন্তব্য করছি না। আমি বলেছি, হ্যাঁ শুনলাম। ঠিক আছে। আমি জিজ্ঞাসা করবো। এই পর্যন্ত বলে দিলাম। ঐ সমস্ত শোনা কথার ওপরে কোন মন্তব্য করবে না। সব সময় আমার নির্দেশগুলো সুন্দরভাবে পালন করবে। সুন্দরভাবে সবকিছু দেখবে।

এই বাপী (নদীরামের ছেলে), চিন্তা কইরা দেখ, কি ফ্যাসাদে পড়ছে। উপায় নাই, উপায়ই নাই। কি বিপদে পড়ছে। সবাই ভাল রিপোর্ট দিতাছে। পড়াশুনা করতে বলছি। কোন আজেবাজে কথা কেউ বলতে যাবে না। ওকে যদি গড়াতে পার, তবে বাঁচবে। গড়াতে যদি না পার, তবে মরবে। পরিষ্কার তোমাদের জানিয়ে দিলাম। তোমরা সাহায্য করো। আমি গড়ার পক্ষে। 'ও' (বাপী) যদি ঠ্যাংটা বাঁচাতে চায় আমার নির্দেশ পালন করতে হবে, তা নাহলে কিন্তু উপায় নাই। একেবারে পরিষ্কার। চক্ষের সামনে পরিষ্কার দেখতাছি আমি। আমি পেপারে (সংবাদপত্রে) দিয়া চ্যালেঞ্জ (Challange) করতে পারি, কে আছে, কে ওকে রক্ষা করতে পারে? ওকে (বাপীতে) গভর্ণরের বাড়ীতে নিয়া রাখুক। একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস ঘরে ওরে (বাপীরে) রাইখা দিক। এরকম চ্যালেঞ্জ করবে কেউ? বল? শুনতে চাইছিল কে কে? কে শুনতে চাইছিল? 'ক' শুনতে চাইছিলা তো? যেটুকু বলছি, তাতে চলবে তো? যেটুকু বলছি, এখন শুনলে। পরবর্ত্তীটা পরে শুনানো হবে।

'ক' গরজ করেছিল। 'ও' বলেছিল, আমি তৈরী হতে চাই। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি তো আমরা করি। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তো জানি না। আমরা তৈরী হতে চাই। সেই নির্দেশগুলো আমরা নিতে চাই।

'ক' গরজ করেছিল। 'ও' বলেছিল, আমি তৈরী হতে চাই। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি তো আমরা করি। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তো জানি না। আমরা তৈরী হতে চাই। সেই নির্দেশগুলো আমরা নিতে চাই।

তুমি সুজাতা, এই নির্দেশগুলো দিয়া এইগুলি লিখা, নির্দেশটা পইড়া সবাইরে শুনাবা। মাইকে সবাইরে শুনাইবা। ব্যাস্ পরিষ্কার হইয়া গেল। একটার থিকা আরেকটা বাইরাইয়া গেল। আরও ভাল হইল।

আমি সব সন্তানদের এবং সংগঠনের সবাইকে বলছি, সুন্দরভাবে চলবে। 'ম', 'ম'র উপরে আমার খুব আস্থা আছে। 'ম' আমারে জীবনে ফাঁকি দেয় নাই এখনও পর্যন্ত। 'ম'র দেমাক নাই, কিচ্ছু নাই। ম'রে আমি স্নেহ করি। আমি 'প'রে বলছি, ভুলে যাও আগের কথা সব। পরিষ্কার একেবারে এখন নফর হও, হরিজন হও। সব কাজের মধ্যে যাবে। সব কাজে যোগ দেবে। সব কাজ চালিয়ে যাবে। সব দেমাক চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে দাও। ঘরের ছেলে যেমন ছিলে একদিন, তেমনি হয়ে যাও। সেই দোগাছির বাড়ী থেকে এখন পর্যন্ত তুমি আমার কাছে আছ। সেভাবে চল। 'ক' 'খ' থেকে শুরু করে প্রত্যেক সন্তানরে বলছি, সহজ সরল হয়ে যাও। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সাহায্য সহযোগিতা করবা। কেউ কাউকে ঠেস দিয়ে কথা বলবে না, আঘাত দিয়ে কথা বলবে না। যা বলবা, সহজভাবে বলবা। মনের মধ্যে কোন কূট রাইখা বলবা না। তবেই জিনিসটা সুন্দর হবে।

আমি দিনরাত পরিশ্রম করছি। এতবড় বিরাট সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছি। আমি জুয়াচুরিও করছি না। ভন্ডামিও করতে যাচ্ছি না। আমি সহজ সরল মনে সবার সঙ্গে ব্যবহার করছি। এতবড় সংগঠন চালানো সম্ভবপর কথা? সহজ কথা? কতগুলি লোক আসছে, খাচ্ছে, একসঙ্গে আছে, রান্নাঘরে রান্না

আমি দিনরাত পরিশ্রম করছি। এতবড় বিরাট সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছি। আমি জুয়াচুরিও করছি না। ভন্ডামিও করতে যাচ্ছি না। আমি সহজ সরল মনে সবার সঙ্গে ব্যবহার করছি। এতবড় সংগঠন চালানো সম্ভবপর কথা?

হচ্ছে। চিন্তা কইরা দেখ তো, কি পরিশ্রম আমি করছি। আমি কারও থিকা টাকা ছিনাইয়াও নেই না। আমি কারও থিকা ১টি পয়সাও গ্রহণ করি না। তবে কৌশল আমি করি। কৌশল না করলে উপায় নাই। একটা লোক বাঁচবে না। তাকে ৫ দিন ঘুরাই, ১০ দিন ঘুরাই। তাও আমি তারে গুছাইয়া দেই। কালকে যে হরির লুট দিছে ১০ সের বাতাসা দিয়া, ছেলেটা মইরা গেছিল গিয়া। অবাক কান্ড। মরা ছেলেটা, ডাক্তার declare কইরা দিছে মারা গেছে। আমি গিয়া বলছি, 'মরে নাই যা। বাঁচা আছে।'

বল কি বাবা?

৪টা/৫টার সময় দেখছে মইরা গেছে। তারপর গিয়া দেখে, বাঁচা আছে। ১০ সের বাতাসা আইনা লুট দিছে। সবাইরে চিৎকার কইরা বলতাছে। আবার আরেকটা ছেলে মারা গেছে। **একজনের বউ আমার সম্বন্ধে আগে বলছে, 'শকুনের শাপে কি গরু মরে?' আমার এক শিষ্য তারে বলছে, 'দেখহে, আমার ঠাকুর খুবই সদাশিব। আবার তিনি কিন্তু কাঁচা খেকো দেবতা। তাঁর পিছনে লাগতে যেও না। একটা লোকও শান্তি পায় নাই।** যতগুলি গেছে, একটা করে মরে গেছে, আঘাত পেয়েছে।' সেই বউটার একমাত্র ছেলে, ১২ বছরের ছেলে জলে ডুইবা মারা গেছে। চিৎকার কইরা কাঁদছে স্বামী-স্ত্রী। স্বামী বলেছিল, 'চল, তাঁর কাছে দীক্ষা নিই।' স্ত্রী বলছে, 'আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নেব না।' কাল আইয়া বলতাছে, দীক্ষা দেও বাবা।আমি অন্যায় করেছি।'

একজনের বউ আমার সম্বন্ধে আগে বলছে, 'শকুনের শাপে কি গরু মরে?' আমার এক শিষ্য তারে বলছে, 'দেখহে, আমার ঠাকুর খুবই সদাশিব। আবার তিনি কিন্তু কাঁচা খেকো দেবতা। তাঁর পিছনে লাগতে যেও না। একটা লোকও শান্তি পায় নাই।

সকালে এসেছিল। দীক্ষা দিয়া দিলাম। বলেছি, 'আর একটা ছেলে যাতে পেটে আসে, তার ব্যবস্থা করছি।' বনগাঁ থেকে এসেছিল। কি করবে তুমি? সবই যদি উড়াইয়া দাও, তবে তো চলবে না। আবার যেগুলি পাশ করবে না, ভাল হইব না, তাগো ঘুরাই। এর-ওর কাছে পাঠাই। আবার অনেকরে পাশ করাইয়া দেই। দুইশো'র উপরে পাশ করাইয়া দিছি। নীহারের*

---

* সুধচরধামের বহু পুরানো আবাসিকদের মধ্যে শ্রীমতি নীহার দাসের নাম কারও অজানা নয়।

কাছে পাঠাই। না হইলেও প্রায় ২০০ জনরে পাঠাইছি।

গাইনোকলজিষ্ট, এক ডাক্তার, আমার ভাইঝিরে খুব service দিছে। তার বাচ্চা হবার সময়ে আঁতুর ঘরের মতন নিজে থাইকা, সব করছে। ১ পয়সাও নেয় নাই। আরেকটা কইছিলাম, সেইটাও নেয় নাই। আমারে কইছে, 'আমারে এইটাই আশীর্বাদ করো, আমি যেন M.S. পড়তে পারি। আমার মত বিদ্যায় আমার মত লোকের M.S. পড়ার ক্ষমতা নাই।'

'আমারে এইটাই আশীর্বাদ করো, আমি যেন M.S. পড়তে পারি। আমার মত বিদ্যায় আমার মত লোকের M.S. পড়ার ক্ষমতা নাই।'

প্রায় ৪০০ জন পরীক্ষা দিছে। ৫ জন পাশ করাইব। প্রথম পরীক্ষা ভাল দিছিল। সেটা Cancel হইয়া গেছে। পরে পরীক্ষা দিছে ৮/১০ দিন আগে। আইয়া কান্নাকাটি করতাছে, 'পরীক্ষাটা ভাল হয় নাই।' ৫টা answer একেবারে ভুল কইরা ফেলাইছি।' আমি থাপ্পর দিয়া কইছি, 'যা'।

কালকে result বাইরাইছে। কালকে এখানে আইসা উপস্থিত হইছে। পাশ করছে। আইলেই একটা থাপ্পর দিছি, কি রে হারামজাদা, হইছে তো?

সুখচরধামের ছেলেমেয়েদের তিনি ছিলেন শিক্ষিকা। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি ধামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন। অভিভাবকরাও ছিলেন এই দিদিমণির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

আমাদের শ্রদ্ধেয়া নীহারদির কিন্তু আরও একটি পরিচয় আছে। সেটি না বললে মনে হয় তার পরিচিতি যেন অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে।

শ্রীমতি শৈলবালা দাস ও তার তিন পুত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিধবার সম্পত্তি অপহরণের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হাজতে পাঠাবার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর আইনের সাহায্যে লড়াই করে মিথ্যা মামলার চক্রান্ত ভেদ করে সসম্মানে জয়লাভ করেছেন। সেই দুঃসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমতি নীহার দাস। তিনি হলেন শ্রীমতি শৈলবালা দাসের কন্যা। সেই সময়ে মা ও ভাইদের মিথ্যা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষে সাক্ষ্যদান করেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে নীহারদির প্রাণনাশের চেষ্টাও করেছিল ষড়যন্ত্রকারীরা। কোন দিকে না তাকিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয়া নীহারদি পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তার মা ও ভাইদের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এর জন্য তাকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই আত্মত্যাগের সত্যিই কোন তুলনা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মত্যাগের মহিমায় নীহারদির নাম আমাদের অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঘটনা যদি দেখ, অবাক হইয়া যাবে। সকাল থিকা কত ঘটনা ঘইটা যাইতাছে। সব ঘটনা যদি দেখন যায়, শুধু আশ্চর্যের পর আশ্চর্য হতে থাকবে।

যা। কে ভরসা দিছিল? কইছিলাম, 'আমি কইরা দিমু। তুই যা'। প্রায় ৪০০-র মধ্যে ৫ জন পাশ। শতে প্রায় ১ জন। 'ও' খুশীতে আত্মহারা। এত হাজার হাজার আইতাছে। কিছু ঘুরাই। কিছু এদিক ওদিক করি। নাইলে কেমনে হইব? ওর (আবাসিকের) কাছে যাও। এর কাছে (আবাসিকের) যাও। করতেই হয়। নাইলে চিৎকারের ঠেলায় উঠতেই পারুম না। আবার কিছু কিছু ব্যবস্থা কইরা দেই। কত ছেলে হারাইল। কত ছেলে আইল। এই তো আজকে যে ছেলেটা আইল, চইলা গেছিল গিয়া, কান্নাকাটি হৈহল্লা। সেই ছেলে আইছে। অরে ১ মাস কামধেনু বাগানে রাখতে কইছি। ঘটনা যদি দেখ, অবাক হইয়া যাবে। সকাল থিকা কত ঘটনা ঘইটা যাইতাছে। সব ঘটনা যদি দেখন যায়, শুধু আশ্চর্যের পর আশ্চর্য হতে থাকবে। কিছু ঘুরাই। কিছু করে দিই। কিছু এদিক ওদিক করি। বুদ্ধি পরামর্শ দেই। বাঁচার জন্য চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যবস্থা কইরা দেই। একেবারে guarantee দিয়া দেই, 'তুই যা। বাঁইচা যাবি'। আমার ভরসায় যায়। আবার অনেকরে ঘুরাইতে ঘুরাইতেই শেষ পর্যন্ত যায় গিয়া। 'বাবা, আমারে কিছু করলা না। আমি fail হইয়া গেছি।' জানাই তো আছে fail, করুম আর কি। অগো ধমক দিলাম। কৌশল করতেই হয়। 'এই, তুই একথা বললি কেন?' কৌশল করি। কৌশল আবার বইলা দেই। রুটিন দিয়া দেই পড়ার। তারপর পাশ যখন করে, বইলা দেই, এই কৌশল করছিলাম তর লইগা। ফাঁকি রাখবো না। কাউকে ফাঁকি দিয়া রাখতে রাজী না। তাই কৌশল করলে সেইটা আবার বইলা দেই।

চোখ বুঁইজা বইসা থাকলে বইলা দেই। তোমাগো লইগা চোখ বুঁজছিলাম। ধ্যান করি নাই। ফাঁকি দিয়া আমি নিজেকে established করতে রাজী নই। সত্য কথা বলে যদি established হতে পারি হবো, নাহলে দরকার নাই। না হলেও আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সন্তানতো করেছি। ভারতবর্ষে এত সন্তান আছে কারও? এত কোটি সন্তান আছে? অসম্ভব। রবিবার এগারশো/বারশো দীক্ষা নিছে। সব লিখতে পারে না। কে লিখবে এত নাম?

ফাঁকি দিয়া আমি নিজেকে established করতে রাজী নই। সত্য কথা বলে যদি established হতে পারি হবো, নাহলে দরকার নাই।

৩০০ জন দীক্ষা নিলে ১৫০ জনের নামই minus হয়ে যায়। বাদ পড়ে যায়। এই একটা সুন্দর আলোচনা কইরা দিলাম। একটা class করা দরকার ছিল তোমাদের জন্য। বড় হইছে না class-টা? এর প্রয়োজন আছে। বইসা বইসা সাতে পাঁচে তিনে দুইয়ে চিন্তা কইরা সময় নষ্ট করবা না। যাও, এখন sincerely work কর। Sincerely কাজ কর। ছেলেরা, মেয়েরা, বৌরা সব (সব সংগঠনের) একত্র হইয়া সুন্দরভাবে কাজ করবা। ঘুম থিকা উইঠা একে অপররে 'রাম নারায়ণ রাম' বইলা সম্বোধন করবা। রাম নারায়ণ রাম বইলা কাম (কাজ) করবা। একজন আরেকজনরে বলবা, রাম নারায়ণ রাম। ডাকছো আমাকে? কেন? এইভাবে বলবা। কত ভাল লাগবে। এক একজনরে একেক কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। কেউ কাউরে কথা শোনাবে না। রাগ বা অভিমানের সুরে কেউ কাউকে কথা বলবে না। এতে মন নষ্ট হয়ে যায়। Damage হয়ে যায়। ভাল ব্যাটারিটা যদি ঠান্ডায় রাখ, damage হইয়া যাইব গিয়া। যন্ত্রপাতি damage হইয়া যায়, মরিচা পইরা যায়। ধারাল জিনিসে মরিচা পইরা যায়। পূজার খড়্গটা ফেলাইয়া থুইছে। এক বছরের মধ্যে মরিচা পইরা গেছে। মনটা এরকম মরিচা পইরা যায়। কেউ আমারে গালি দিয়া গেলেও তো আমি রাগ করবো না। সময় নষ্ট। গালি দিছে, গালি দেওয়ার মত উপযুক্ত মনে করছে, তাই দিছে। যদি কোনদিন নিজের ভুল বোঝে, বুঝবে। বলে যাব। যদি বিশ্বাস করে করবে। না করে, না করবে। আমি এই নিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজী নই।

কে কতবার Complain করেছে (কথা শুনিয়েছে), সেটা note করা হবে। **আর যে কোন কথা নিয়া, সংগঠনের মধ্যে সামান্য ব্যাপার নিয়া, কাজকর্ম নিয়া যদি কোন তর্কবিতর্ক হয়, রাগারাগি হয়, কথা শুনানো হয়, সেইসব বিষয়, আমার (ঠাকুরের) কাছে বলা নিষেধ। তার কারণ এখন সময় পেলেই তিনি লেখানোর কাজে মন দেবেন। ঐসব বিষয় নিয়ে পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেন মাথা ঘামাতে না হয়। তারজন্য প্রতিটি সংগঠনের সকলের দৃষ্টি যেন থাকে।** যে কেউ যে বিষয়

আর যে কোন কথা নিয়া, সংগঠনের মধ্যে সামান্য ব্যাপার নিয়া, কাজকর্ম নিয়া যদি কোন তর্কবিতর্ক হয়, রাগারাগি হয়, কথা শুনানো হয়, সেইসব বিষয়, আমার (ঠাকুরের) কাছে বলা নিষেধ। তার কারণ এখন সময় পেলেই তিনি লেখানোর কাজে মন দেবেন। ঐসব বিষয় নিয়ে পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেন মাথা ঘামাতে না হয়। তারজন্য প্রতিটি সংগঠনের সকলের দৃষ্টি যেন থাকে।

নিয়ে তর্ক বিতর্ক বা খোঁচানি কথা বলবে, কেউ যদি মনে করে যে, আমাকে খোঁচা দিচ্ছে বা আমাকে এই বিষয়ে কথা শুনিয়েছে, (নিজেদের মধ্যে) এরকম যদি কেউ মনে করে, সে সেটা note করে রাখবে। চুপ করে note করে রেখে দেবে। তার প্রতিবাদে তর্ক বিতর্ক না করাই শ্রেয়। অসম্মানজনক কথা বা আঘাত দিয়ে কথা বলা নিষেধ। যদি কেউ করে, তবে সেগুলো চুপ করে শুনে যাবে। প্রতিবাদ করতে গেলেই সেখানে বিবাদের সৃষ্টি হবে। পরিবেশটা খুব শান্তির হওয়া চাই। হিংসা, দ্বেষ, রাগ, মেজাজ এখানে চলবে না। এই যে এত হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আমি দেখা করি, প্রত্যেকের সঙ্গে আমি cool brain-এ মিষ্টি মুখে কথা বলি। যতজন আসছে, প্রত্যেকের সম্বন্ধে একই ব্যবহার, একই কথা।

হিংসা, দ্বেষ, রাগ, মেজাজ এখানে চলবে না। এই যে এত হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আমি দেখা করি, প্রত্যেকের সঙ্গে আমি cool brain -এ মিষ্টি মুখে কথা বলি। যতজন আসছে, প্রত্যেকের সম্বন্ধে একই ব্যবহার, একই কথা।

অযথা ধারণার উপরে কোন মন্তব্য করা, চিন্তা করা বা কথা শোনানো একেবারে নিষেধ। ঠাকুর কাকে কিভাবে গড়ান, কোন্ পথে গড়ান, সেটা শেষ না হওয়া অবধি, শেষ না জানা অবধি, কারও কোন মন্তব্য সেখানে না করাই বিধেয়। তার একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে। জগন্নাথদেবের মূর্তি যখন গড়ান হয়, এটাই কথা ছিল, কেউ যেন চুপি (উঁকি) না দেয়। চুপি দিলে মূর্তি গড়ানোর কাজ সেখানেই শেষ হবে। সেটা দেখবার জন্য একজন চুপি দিল এবং মূর্তির হাত, পা গড়া শেষ করতে পারলো না। ঐখানেই ঠুন্ডা জগন্নাথ হইয়া রইল। সেরকম ঠাকুর কোন্মতে কিভাবে কাকে কোন্পথে গুছিয়ে নিচ্ছেন, চালিয়ে নিচ্ছেন, সেটা শেষ অবধি না দেখা অবধি ধারণার বশে কোন মন্তব্য করা নিষেধ। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনা করা নিষেধ। কাকে আমি বেশী ডাকলাম, কাকে আমি কম ডাকলাম, কার সাথে বেশী মিশলাম—এই যে পক্ষপাতিত্বের মতন চেহারাটা, এইটা এই নয় যে, অন্যের চেয়ে তাকে বেশী favour করা হচ্ছে। ভুলটা করে মানুষ এইখানে। নিজের সাধারণ জীবনের চিন্তা দিয়া অপরকে ভুল বুঝে। সেই ভুলের জন্য দায়ী বা দোষী ঠাকুরকে করা চলবে না। যে ভুলটা করবে, সেই তার দায়দায়িত্বে

পড়বে। সবচেয়ে ভাল জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। যদিও আইনে আটকানো হয়েছে, তবু যদি এরকম কারো মনে আসে, সহজ সরল মনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাই সবচেয়ে শ্রেয়। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার, জিজ্ঞাসা না করাই বিধেয়। তার কারণ সেই সময় ঠাকুর যেই যেই নির্দেশ দেবেন, যে কথা বা যা যা বলবেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সে যদি সেখানে তার দ্বন্দ্বটাই প্রবল করে দেখায়, এটা যদি বুঝতে পারা যায়, তবে সেটা সুন্দর নয়। সেইজন্য তোমাদের কাছে এটা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সেদিন নদীরামের ছেলে (বাপী-আবাসিক) দাঁড়িয়েছে এখানে। এরকম হাজার হাজার ঘটনা আছে, আমি যেদিন যেটা বলেছি, সেটা ঘটেছে, সেটা হয়েছে। তা নিয়ে আমি কারও কাছে ঢোল বাজিয়ে প্রচার করতে যাইনি। কথা প্রসঙ্গেই বলছি, নদীরামের ছেলে এখানে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মনের মধ্যে আসলো। হঠাৎ ওর একটা ঠ্যাং (পা) দেখতেছি না। পা-টা দেখছি না কেন? পা আছে, পা দেখছি না। তখনই আমি চিন্তা করতে শুরু করেছি। পা-টা দেখছি না কেন? এটা সেপ্টেম্বর মাস, ঠিক আছে। অক্টোবর মাস, পা ঠিক আছে। নভেম্বর মাস, ঠিক আছে। ডিসেম্বর মাস, ঠিক আছে। জানুয়ারী মাস, ঠিক আছে। ফেব্রুয়ারী মাস ১/২/৩ তারিখ ঠিক আছে। ৮ তারিখ ঠিক আছে। ১০ তারিখ ঠিক আছে। ১১ তারিখ, দেখি, ঠিক নাই। কেমনে আমি calculation কইরা নিজেরে ধরলাম। Calculation কইরা দেখি, ১১ তারিখ থিকা পা-টা নাই। আমার mind শিশুবয়স থিকাই এত speed-এ চলে, যেটা একবছর, দেড়বছর পরের ঘটনা ফট্ কইরা দেইখা ফেলাই। আইসা পড়ে automatically. এটা চিন্তার কারণে হয় না। স্বাভাবিকক্ষেত্রে চিন্তাটা ৩ বছর/৬ বছর এগিয়ে যায়। এটাও সেই হিসাবেই দেখি যে, ওর ঠ্যাংটা নাই। ১১ই ফেব্রুয়ারী অর (বাপীর) ঠ্যাংটা কাটা যাইতেছে। এই যে বাপী, এই ছেলেটা। ওরে বললাম, ১১ই ফেব্রুয়ারী তোর ঠ্যাংটা কাটা যাবে। তুই ক্রাচ্ order দিয়া দে। বানাইয়া রাখ। যতই ঘর বন্ধ কইরা রাখ, দরজা

আমার mind শিশুবয়স থিকাই এত speed-এ চলে, যেটা একবছর, দেড়বছর পরের ঘটনা ফট্ কইরা দেইখা ফেলাই। আইসা পড়ে automatically. এটা চিন্তার কারণে হয় না। স্বাভাবিকক্ষেত্রে চিন্তাটা ৩ বছর/৬ বছর এগিয়ে যায়।

৫০০টা তিল একত্র করলে, সেই পরিমাণ যদি আমার নির্দেশটা carry করতে পারিস, ঠিক ৫০০ তিল। ৫০০ তিল যদি আমি set করতে পারি আমার নির্দেশে তবে আমি তোরে রক্ষা করতে পারি।"

বন্ধ কইরা রাখ, রেহাই পাবে না। হবেই। ১১ই ফেব্রুয়ারী first বেলা না। Second বেলা থিকা, দুইটা, আড়াইটার পর থিকা। দেইখা ফেলাইছি এইটা। দেখাতে মনটা খারাপ হইয়া গেল। তখন 'ও' (বাপী) কান্নাকাটি করতাছে। কেমনে রক্ষা পাওয়া যাবে? জানতে চাইতেছে। বললাম, "রক্ষা পাওয়ার মতন কিছু নাই। তবে তুই কাজ কর। তর (তোর) স্বভাব দিয়াই তরে আমি রক্ষা করার চেষ্টা করবো। ৫০০টা তিল একত্র করলে, সেই পরিমাণ যদি আমার নির্দেশটা carry করতে পারিস, ঠিক ৫০০ তিল। ৫০০ তিল যদি আমি set করতে পারি আমার নির্দেশে তবে আমি তোরে রক্ষা করতে পারি।"

তা না হইলে তরা (তোরা) একটা কাজ কর। ঠাকুরকে experiment কর। একটা document লেখ। আমি এটা সই করে দিচ্ছি। সই করে দিচ্ছি আমি। না হইলে আমার হাত কাইটা ফেলাইয়া দেব। তুই বাড়ী যাইয়া থাক, তুই দিল্লীতে থাক, তুই দরজা বন্ধ কইরা থাক, আমার কোন আপত্তি নাই। তুই বাঁচ। কিন্তু যদি রেকর্ডটা না হয়, ১১ই ফেব্রুয়ারীতে যদি এটা না হয়, আমি হাতটা কাইটা দেব। আমি লেইখা দিচ্ছি। সুতরাং এটা তো একটা পরীক্ষা। তোরা একটা ঘটনা পাইয়া গেলি। আমি straight দেখাইয়া দেব, ঘটনাটা কেমনে ঘটে। Nature থিকা কিভাবে আসবে, কেম্‌নে আসে, এটা পরীক্ষা। তোরা তাকাইয়া থাইকা দেখ। অর (বাপীর) লগে লগে থাকতে হয়। সাথে সাথে তোরা থাক। ঘটনাটা তোরা দেখ। প্রকৃতির থেকে যে ঘটনাটা হয়, কিভাবে ঘটনাটা ঘটে, তাকাইয়া থাইকা দেখ। ঠ্যাংটাই শুধু যাইব। হাতে একটুও চোট লাগবো না। ঘটনাটা কিভাবে ঘটে, চোখের সামনে তরা দেখবি। চোখের সামনে দেখতে গিয়া তরা না হয় দেখলি, অর তো জান লইয়া টানাটানি। সেটায় আমি নাই। আমার প্রয়োজন নাই। আমি যা দেখছি, বলে দিয়েছি। এখন প্রতিকার চাইছে আমার কাছে। কি কইরা safe করা যায়? আমি কইলাম, "মিথ্যা কথা বলবে না। চুরিধারি করবে না। ছল চাতুরী করবে না। Time-মতন কতগুলো পড়াশুনার ভার দিয়া দিছি। সুন্দরভাবে সবার মাঝে চলবি। তুই এই কটাই করবি। বেশী পূজাও দিলাম না, যজ্ঞও দিলাম না। তরে অন্য কিছু ঠাটে ফাটে কোন কিছুতে রাখি নাই। তর বাবার পয়সা খরচা আর

করতে হইল না। এটুকুই কর। এক একদিন যাইব। এই কয়দিনে ৯ তিল-এ আইছে। ৯ তিল পর্যন্ত হইছে। ৫০০ তিল যদি এই কয়দিনে কইরা ফেলাইতে পারস্ তাইলে রক্ষা পাইয়া গেলি। আমি দেখাইয়া দিছি সবাইরে। তোমরা দেখবা। এই কয়দিনে ওর আচরণে ব্যবহারে কতটা কি করে। জানের (প্রাণের) জন্য 'ও' (বাপী) করতে বাধ্য। তা না হইলে তো মরবে। 'ও' যদি কয় 'দেখি'। দেখুক। আমি দেখার জন্যই সবাইকে বলেছি। দেখ তোরা সবাই। সুতরাং বুঝতে পেরেছ?

আজ আমার কাছে তোমরা ছল চাতুরী করতে পার, ফাঁকি দিতে পার, টাকা পয়সা লুকাইতে পার বা এদিক ওদিক করতে পার, অনেক কিছুই করতে পার। মনে করলা, ঠাকুরতো খেয়াল করবেন না। আমি দিল্লীতে বইয়া আকাম করলাম, ঠাকুর জানতেও পারবেন না। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ফাঁকি দিতে পারে নাই। কেন? আমি যন্ত্রটা fit কইরা থুইয়া দেই। প্রথম কিছু দেখি না। কিন্তু এমনই আশ্চর্য যেই যেই কাজ তুমি করে যাচ্ছ, **সব আমার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।** ক্যামেরায় যেমন ছবি ওঠে, সব ছবি উঠে যাচ্ছে। আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা যদি correct থাকে, অর্থাৎ তোমার ধারণায় যদি আমি বদামি করি, তাইলে তুমি correct. আর আমি যদি সেই point-এ না থাকি, পবিত্র থাকি, শুদ্ধ থাকি। আমার মন যদি সেদিকে না থাকে, তাইলে তোমার যে ধারণাটা, আমার উপরে যে অযথা 'ই' (দোষারোপ) করলা, একেবারে সুদে আসলে তার reaction তুমি পাইতে বাধ্য। এই ব্যাপারে আর রক্ষা পাইবা না। কেউ রক্ষা পায়নি।

আমি দিল্লীতে বইয়া আকাম করলাম, ঠাকুর জানতেও পারবেন না। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ফাঁকি দিতে পারে নাই। কেন? আমি যন্ত্রটা fit কইরা থুইয়া দেই। প্রথম কিছু দেখি না। কিন্তু এমনই আশ্চর্য যেই যেই কাজ তুমি করে যাচ্ছ, সব আমার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

তাইলে হিমাংশু দাশগুপ্ত*, Court Inspector, যেভাবে আমারে

---

* ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ তখন ঢাকাতে আছেন। সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে চলেছে। দেশ গৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় একদিন বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

কাঁচকলা দেখাইছিল, আমার মুখের সামনে। তারপরে বলছে, তান্ত্রিক আপনি, তুকতাক করেন, মানুষের সর্বনাশ করেন। আপনি আমার কি করতে পারেন? কাঁচকলা দেখাইছে।

আমি চটি নাই, রাগ করি নাই। আমি বলেছি, 'দাশগুপ্ত, আপনি চিটাগাঙের বালক সাধুর* কথা বলছেন। ভুল করছেন।' তারপরেও সে চইটা উঠছে। আরেকজন ভদ্রলোক বলছে আপনি ভুল করছেন হিমাংশুবাবু। ইনি কিন্তু সেই বালক সাধু নন।

— না, না আমি জানি জানি। আপনাকে জানি। আপনি আমার কিছু করতে পারবেন?

আমি বলেছি, আজ থেকে ১ মাস পূর্ণ হবার দিন আপনি গলায় রক্ত উঠে মারা যাবেন। আমি নিমতলার** বাসার নীচে দাঁড়াইয়া থাইকা আপনাকে টা টা করবো।

এমন একটা অট্টহাসি, এমন একটা বিদ্রূপাত্মক হাসি দিল যে, কি বলবো। আমি শুনলাম। তারপর বললাম, ঠিক আছে। এটা ছড়িয়ে গেল সমস্ত লালবাজারে। সবাই জানে এটা।

আর কল্যাণ দত্ত, আমারে একটা চটকণা (চড়) মারছিল। ঠাস্ কইরা মাথায় মারছে।

তাঁর চলে যাওয়ার খবর যখন জানা গেল, তখন তিনি ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যই দেশ ত্যাগ করেছেন, এই কথা বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত ভারতবর্ষে।

এমনি সময়ে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর একখানি ফিটন গাড়ীতে চেপে ঢাকার আরমানি টোলায় এক ভক্ত শিষ্যের সঙ্গে যাচ্ছিলেন তার অসুস্থ পুত্রকে দেখতে। সঙ্গে ছিল আরও দুজন ভক্ত শিষ্য রবি ঘোষ ও দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী। গাড়ী ঢাকা কোর্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর রবি ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিরে?

** নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে (৪১নং বি. কে. পাল এ্যাভিনিউ এর) এক বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর তখন থাকতেন।

আমি বললাম, কে. কে. ডাট্ (K. K. Dutt) তোমার এই ডাঁট যদি আমি না ভাঙতে পারি, তোমার ঐ হাত যদি এই চরণে না ফেলতে পারি, তবে আমার এই হাত চৌরঙ্গীর মোড়ে টাঙাইয়া রাইখা দেব।

কল্যাণ দত্ত কইছিল, I shall see (আমি দেখবো)। আমি বললাম, I will see (আমি দেখবোই)। Must হয়ে গেল। চললো, চললো যুদ্ধ চললো। আমি যুদ্ধ চালাইলাম।

'ও' (কল্যাণ দত্ত) ছিল ফরিয়াদীর কাঠগড়ায়। আমরা ছিলাম আসামীর কাঠগড়ায়। আমরা গিয়া অরে (কল্যাণ দত্তরে) আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইলাম। ছয় ছয়টা কেসে অরে (ওকে) দাঁড় করাইলাম, আসামী করলাম। আর এমন case আর এমন সাক্ষী যে, প্রত্যেকটি কেসের punishment (শাস্তি) হয়ে যাচ্ছে আলাদা আলাদা। তখন খাস্তগীর ছিল। আরেকজন ছিল কুমার কান্তি। খুব কড়া। কুমার কান্তি বললো, K. K. Dutta, তোমার কিন্তু punishment হয়ে যাচ্ছে। আর উপায় নাই। বাঁচতে যদি চাও ঠাকুরকে গিয়ে ধরো। সে বলে দিল। তারপর যে হাত দিয়া থাপ্পর

রবি ঘোষ উত্তর দেয়, 'এটা কোর্ট, ঠাকুর।' শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বলেন, ''কোর্ট? জানিস রবি, এই সুভাষ বোসের ব্যাপারে পুলিশ অনেকবার নানারকম মিথ্যা মামলায় আমাকে কোর্টে হাজির করাবে।''

শিষ্য তিনজনই উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কবে? ঠাকুর কবে?'

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলেন, ''সময়মতো দেখতেই পাবি।''

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই রহস্যময় হাসির উত্তর মিললো যথাসময়ে। সেই সময়মতো দেখার তারিখটি হলো, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর। জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সন্তানগণের কাছে এই দিনটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয় দিন। আমরা তাঁর সন্তানেরা মনে করি, এই দিনটি সারা বিশ্বের কাছে এক বিশেষ কলঙ্কিত দিন। যে জন্মসিদ্ধ মহানের পুণ্য পাদস্পর্শে এই পৃথিবী ধন্য, এই পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণা পবিত্র, সেই জন্মসিদ্ধ মহানকে এক মিথ্যা মামলার আসামী সাজিয়ে এইদিন গ্রেপ্তার করা হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আরও ৫০ জন ভক্তশিষ্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যায় লালবাজারে। লালবাজার থেকে প্রচুর পুলিশ বেশ কয়েকটা প্রিজনার ভ্যান, লরী ও জিপ নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ৪৬, ভুপেন বোস এ্যাভিনিউয়ের কলকাতার বাড়ী থেকে তাঁকে ও তাঁর জনা পঞ্চাশেক ভক্ত শিষ্যকে গ্রেপ্তার করে।

দিছে, সেই হাতের হাড্ডিটা এইখান দিয়া বাইরাইয়া গেল গিয়া। সবাই দেখছে। একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা। সে (কল্যাণ দত্ত) সেইখানে (আমার কাছে) গিয়া জ্ঞানশঙ্কর উকিলরে ধইরা ক্ষমা চাইছে। সে পায়ে ধইরা ক্ষমা চাইছে, 'আমারে বাঁচান।' আমার এক একটা কেসে ছয় বছর করে ছয়ে ছয়ে ৩৬ বছর জেল। অন্ততঃ ১২ থিকা ২০ বছর জেল হইয়া যাইব গিয়া। আমার জীবনের সব শেষ হইয়া যাবে। অর (কল্যাণ দত্তের) বউ টউ সব জ্ঞানশঙ্কর উকিলরে ধইরা কান্নাকাটি করতাছে। তখন সে পায়ে ধইরা কাঁদছে আমার কাছে। আমারে বাঁচান।

— কি K. K. Dutt লালবাজারের কথা মনে আছে? তুমি যে বলেছিলে?

— আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আপনি যেভাবে কথা বলেছেন, তাই হল। এইটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

গ্রেপ্তার করে সবাইকে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর এক এক করে সকলকে দোতলায় ডি. ডি. অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে থেকে তারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে গেল। তারপর দারোগার দল প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ধমকানি, শাসানি এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রহারের পর শিষ্য সন্তানদের মধ্যে ১৭ জনকে রেখে বাকী সকলকে ছেড়ে দিল। তারপর তাদের ভাগ ভাগ করে পুলিশ হাজতে পাঠিয়ে দিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আছেন অন্য ঘরে।

পরদিন (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) খুব ভোরে চা খাওয়ার জন্য সবাইকে হাজত ঘর থেকে বারান্দায় নিয়ে আসা হল। সবাই গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের সামনে বসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। এইসময় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে তাদের যেটুকু কথা হল, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে বলে দিলেন, ''ওরা (পুলিশরা) যা করে করুক, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না।'' ইতি মধ্যে চা খাওয়া হয়ে গেলে সবাইকে আবার হাজত ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

এরপর সারাদিন ধরে এক এক করে ডি.ডি. অফিসে নিয়ে ঐ ১৭ জনের মধ্যে অনেককে জেরা, শাসানি, ধমকানি, অনেক ক্ষেত্রে প্রচন্ড প্রহার দিয়ে জানতে চাইল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কোথায় আছেন? এরা তাঁর খবর কি জানে এবং কিভাবে এই সংগঠন চলছে? কিন্তু কারও মুখ থেকে তারা একটি কথাও বের করতে পারলো না। প্রতিটি সন্তানের কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ সেদিন ভিতরে ভিতরে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) চললো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

আমি বলি, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। **একটা লোক যদি জীবনভর আত্মশুদ্ধির চিন্তা করে নিজেকে উৎসর্গ করে, যদি কোন গাধাও করে, তারও বাক্‌সিদ্ধি হইতে বাধ্য। সারাজীবনে আমি ছলচাতুরীতে যাই নাই। মিথ্যা প্রবঞ্চনায় যাই নাই। মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করি নাই। কেন হবে না?**

একটা লোক যদি জীবনভর আত্মশুদ্ধির চিন্তা করে নিজেকে উৎসর্গ করে, যদি কোন গাধাও করে, তারও বাক্‌সিদ্ধি হইতে বাধ্য। সারাজীবনে আমি ছলচাতুরীতে যাই নাই। মিথ্যা প্রবঞ্চনায় যাই নাই। মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করি নাই। কেন হবে না?

এদিকে তখন সবাই বলছে, হিমাংশু দাশগুপ্ত, আপনি কিন্তু ভুল করেছেন।

সে বলে, দেখবো আমি।

তার পরদিন (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০) যথা সময়ে সকলকে চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হল। পুলিশের কর্ত্তারা বলতে লাগলো, আজকে কোর্ট থেকে লালবাজারে ফিরিয়ে নিয়ে আবার আড়ং ধোলাই লাগাবে। দেখবে, কি করে খবর বের করতে না পারে, সুভাষ রোগ বন্ধ করতে না পারে এবং দেশের পরিবর্ত্তন আনার, সরকারের কাঠামো পরিবর্ত্তন করার পরিকল্পনা ওরা কি করে জানাতে না পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। আরেকবার লালবাজারে ফিরিয়ে নিলে কাউকে আর আস্ত রাখবে না। অন্তর্যামী ঠাকুর সবার দুঃখ বুঝলেন। কোর্টের মধ্যে তিনি বললেন, ''তোরা চেঁচিয়ে বল, তোদের মারধর করেছে। গায়ের দাগ দেখা।''

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত পেয়ে সবাই হাকিমের সামনে চেঁচিয়ে মারের কথা বললো; গায়ের দাগ দেখালো। এতগুলো লোকের এভাবে চিৎকারে হাকিম হকচকিয়ে গেলেন। একটা কাগজে ৬/৭ জন ভক্ত শিষ্যের মারের কথা, মারের দাগ এবং নাম লিখে রাখলেন। কোর্ট ইনস্পেক্টর হিমাংশু দাশগুপ্ত ছেলেদের জামিনের প্রবল বিরোধিতা করতে লাগলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষের উকিল অনেক আর্গুমেন্ট করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জামিন পাওয়া গেল না। শুধু (লালবাজারের) পুলিশ হাজতের বদলে জেল হাজতের আদেশ হল। ৬ দিন পরে মামলার পরবর্ত্তী শুনানির তারিখ দেওয়া হল।

পরের তারিখে আবার সবাইকে চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করানো হলো। যথা সময়ে মামলার শুনানি আরম্ভ হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষে উকিল শ্রী রাধিকালাল সিংহ ও শৈলেন বসু আর্গুমেন্ট করলেন। তার আর্গুমেন্টের শেষের দিকে শৈলেন বসু বললেন, ''আমাদের মক্কেল এই অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যা বলেছে, তাতে আমরা জানতে পারলাম, লালবাজারে পুলিশ যে

২৬ দিন চলে গেল। ২৬ দিনের রাতে তার জ্বর হইল। বমি হইল। রক্ত পড়লো। ২৯ দিনের দিন অর (হিমাংশুর) এক ভাই দেখতে আসছে। জ্যাঠতুতো ভাই।

— হিমাংশু, শুনলাম তুই অসুস্থ হয়ে পড়েছিস হঠাৎ? তোর কি হইল রে?

তদন্ত অর্থাৎ তদন্তের নামে বিদেশে যাকে 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' (চরম শারীরিক অত্যাচার) বলে, তার প্রয়োগ করছে, শুধু একটি মাত্র কথাই জানাবার জন্য, সেটা হল, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের খবর। সুতরাং মামলার পরিস্থিতি থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ কোন অপরাধই করেনি। পুলিশ শুধু শুধু তাদের হয়রানি ও জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বর্তমান মামলার সৃষ্টি করেছে এবং এই মামলার প্রকৃতই কোন ভিত্তি নেই। শৈলেনবাবুর সওয়াল শেষ হবার পর আদালত সকলের জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর আরও কয়েকটা তারিখ পার হয়। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে চার্জসীট (অভিযোগ) দাখিল করা সম্ভব হল না।

সুযোগ্য চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ বিচারপতি বুঝতে পারেন, মামলাটা সর্বৈব মিথ্যা। পুলিশের কারসাজি তিনি সবই ধরতে পারেন। তাই পরবর্ত্তী তারিখে তিনি সকলকেই মুক্তি দেন। কারণ কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না।

অবশ্য পুলিশ এখানেই থেমে যায় নি। নিজেরা অন্তরালে থেকে এক শিখন্ডীর সাহায্যে তারা ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বিরুদ্ধে আলিপুর কোর্টে এক মামলার সৃষ্টি করে। দীর্ঘ এক বৎসর শুনানী হওয়ার পর হাকিম ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজকে সসম্মানে মুক্তি দেন এবং রায়ে মন্তব্য করেন "The story rings wholly untrue and appears to be false on the face of it." — জনকল্যাণব্রতী এক মহানের বিরুদ্ধে অকারণ পুলিশী তান্ডবের এক নজীর ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের তরফ থেকে প্রহার ও নির্যাতনের অভিযোগে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের (কল্যাণ কুমার দত্ত, সংক্ষেপে K. K. Dutt) বিরুদ্ধে ছয় দফা মামলা রুজু করা হল। তার ভিতর দায়রায় বিচার যোগ্য অভিযোগও ছিল। সেই মামলা ব্যাঙ্কশাল-হাইকোর্ট-ব্যাঙ্কশাল করে প্রায় ১ বৎসর পর বিচারের জন্য আসে। মামলাগুলোর Merit বা গুরুত্ব বুঝতে পেরে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার K. K. Dutt অত্যন্ত শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়ে। সে আরো ভীত হয়ে পড়ে কারণ যে হাত দিয়ে, সে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথায় চাটা মেরে ছিল সেই সময়েই তার সেই হাত আকস্মিক আঘাতে ভেঙে অনেকটা হাড় বেরিয়ে যায়। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ব্যাঙ্কশাল কোর্টের একজন বিশিষ্ট উকিল জ্ঞানশঙ্করের মাধ্যমে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার K. K. Dutt ও তার পরিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্ন হয় এবং সকলের সামনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাকে মামলা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য কাতর আবেদন জানায়। করুণাময় ঠাকুর তদন্তকারী পুলিশ অফিসার K. K. Dutt-এর কাতরতা দেখে তার বিরুদ্ধে মামলা তুলে

— দাদা, আমার এই অবস্থা হইছে। আমি ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজরে গালিগালাজ দিছিলাম। তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। গলা দিয়া রক্ত আইছে।

তিনি তো কাউকে অভিশাপ দেন না।

তুই, ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীকে গালি দিতে গেছিলি? কেন রে?

তিনি বলেছিলেন, এতগুলি লোকরে মকুব (বেল) করতে চাই। বেল (জামিন) সম্বন্ধে 'ই' (আপত্তি) করতে যেও না।

তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এতগুলি কথা শুনাইছি।

— তুই জানিস্ বালক ব্রহ্মচারী আমার গুরু?

এ্যা তোমার গুরু? তুমি তো বল নাই? তাতো জানি না।

— বলবো কি আবার।

— তুমি যাও তাঁর কাছে।

সে আসছে ছুইটা আমার কাছে, 'হিমাংশুরে আপনি বাঁচান।'

নেওয়ার জন্য আদেশ দেন এবং এরকম নির্দেশ দেওয়া একমাত্র ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মতো মহানের পক্ষেই সম্ভব।

*** বালক সাধু** — চট্টগ্রামে বালক সাধু নামে এক তান্ত্রিক ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ঢাকার আরমানি টোলা picture house-এ এসে থাকতেন। সেই তান্ত্রিক সাধুর ভক্তশিষ্যরা তাঁর কাছে যখন যেতেন মুরগী ও মদের বোতল নিয়ে যেতেন।

ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ঢাকা থেকে কলকাতা আসবার পর পরই কিছু তান্ত্রিক সাধক লোক মুখে ঢাকার বালক সাধু এখানে এসেছেন শুনে মুরগী ও মদের বোতল নিয়ে প্রণাম জানাতে আসেন। তাদের দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শিষ্যরা অবাক হয়ে যায়। তারা বলে, ''আপনারা ভুল করেছেন। আপনারা হয়তো অন্য কোথাও যেতে গিয়ে ভুল করে এখানে এসেছেন।''

তারা বলে, ''কেন, এটা বালক সাধুর আশ্রম না? এখানে বালক সাধু থাকেন না, যিনি ঢাকায় থাকতেন?''

শিষ্যরা বলে, ''হ্যাঁ। বালক সাধু অর্থে বালক ব্রহ্মচারী থাকেন।''

তারা নিষেধ না শুনে বালক সাধুকে প্রণাম করতে যান। গিয়ে তাঁকে চাক্ষুষ দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। যাঁকে তারা চান, ইনি তো সেই ব্যক্তি নন। তখন প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। বালক ব্রহ্মচারীকে দেখে তাদের ভুল ভাঙে। নিজেদের আচরণের জন্য এবং মদের বোতল, মুরগী ইত্যাদি নিয়ে আসার জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আমি বলি, too late. ২৮ দিনের দিন bleeding বেশী হইল। ২৯ দিনের দিন death.

নিমতলার বাসার নীচে নাইমা দেখি, শ'-দেড়শো পুলিশ হিমাংশু দাশগুপ্তরে নিয়া যাচ্ছে। আমি টা-টা করেছি। ঐটা বলেছি।

কি হে, পুলিশ ভাই, বড় জাতসাপ। কেউটা হলেও সেও জাতসাপ ভুলে যেও না। বেশী বাড়াবাড়ি আর করতে যেও না। এই কথা বলেছি।

সুতরাং আমি challenge করছি। পত্রিকায় দিয়া দেই। একই কথা। এখানে public আছে। সবাইকে জানাচ্ছি। আমি challenge করছি। তরে (বাপীরে) যদি কেউ safe করতে পারে, আমি নিজে কোপাইয়া হাত কাটবো। আমি সই করে দেব। তোরা চেক (check) কর। অরে তালা দিয়াই রাখুক, যেইভাবেই রাখুক, অরে safe কর। 'ও' (বাপী) safe হোক, আমি চাই। কিন্তু safe হতে পারবে না। রক্ষা পেতে পারে, যে নির্দেশগুলো দিয়েছি, সেগুলো পালন করতে হবে। আগে বলতাম, ৮ দিন আমারে তে (তিন) রাস্তার মোড়ে গালি দিবি, ব্যাধি সারবে। আগে করতাম। ব্যাধি অনেক সারিয়েছি। তবে এটাও একটা বিধি ব্যবস্থা। তুই এই কর। তোর ব্যাধি সারবে। ৯ তিল পর্যন্ত আইছে। ভালর দিকেই আছে। ৫০০ তিলের মধ্যে ৯ তিল আইছে। তিলটা ট্যাক ট্যাক কইরা বাইরা (বেড়ে) যাইব। চ্যানেলটা যদি ভাল রাখতে পারে, তিলটা একেকদিন ৩০/৪০টা পর্যন্ত হইয়া যাইতে পারে গিয়া। তাতে কোন অসুবিধা হবে না। ভাল জিনিস পাবে। Result good. ভালর দিকেই আছে। সুতরাং অযথা কোন চিন্তা কইরা লাভ নাই*।

বাচ্চা বয়স থেকে ঠাকুর তো। ফেলে দিতে পারবে না তো। আজকের থিকা তো নয়। সেই পীযূষের (দোগাছি থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকতো) বাবা আইতো। তখন আমার বয়স কত। পীযূষের তখন দেড়/দুই বছর বয়স। কথার কথা কইতাছি। তার আগের থিকা তো ঠাকুর আমি। পীযূষের

---

* নিজের পা রক্ষা করার জন্য বাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ নির্দেশ গুলি যথাসম্ভব পালন করেছিল, এবং এই বিপদ হাত থেকে রক্ষাও পায়।

মায়রে (মাকে) পীযূষ কতটুকু মনে রাখছে, পীযূষ জানে। এরকম অনেক আছে। হিসাব করতে হবে। গৌরীশঙ্কর কত ছোট ছিল। অগো বাড়ীতে আমি গেছি। অমূল্য বোসের তো এমন এ্যানিমিয়া হইয়া গেছিল যে, blood cancer হইয়া যাইব। অমূল্য বোসের মা মাসিরা আমার মায়ের সই আছিল। সেই সোর্সে আমার কাছে নিয়া আইছে অমূল্য বোসরে। একটা বাচ্চা। আমি কই, এইটারে কি নিয়া আইছো আমার কাছে। আমি ডাক্তার? রামানন্দকে**

** রামানন্দ রায় — ঢাকা টিকাটুলীতে কামিনী জজের স্ত্রীর বাড়ীতে থাকতেন মণিকুন্তলা রায়। জ্যোতিষ রায় ও মণিকুন্তলা রায়ের পুত্র রামানন্দ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। মণিকুন্তলা রায় ছেলেকে সুস্থ করার জন্য বহু ডাক্তার, কবিরাজ এমন কি সিভিল সার্জন পর্যন্ত দেখিয়েছেন। সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির কোন কিছুই বাদ দেননি। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন। ছেলের চিকিৎসার জন্য যে যা বলেছে, তাই করেছেন। শেষবেলা নিজের অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রী করে সন্তানের চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। রামানন্দ দিনে দিনে আরও অসুস্থ হয়ে একেবারে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এদিকে জ্যোতিষ রায় আবার এক মাতাজীর পরম ভক্ত। যা রোজগার করেন প্রায় সবটাই মাতাজীর আশ্রমে দিয়ে দেন। মাতাজীকে রামানন্দের অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বলেন, রামানন্দ বাঁচবে না। তিনি তারজন্য পরলোকে সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।' ছেলের চিন্তায় মণিকুন্তলা রায়ের যখন প্রায় পাগলের মত অবস্থা, তখন তিনি কামিনী জজের স্ত্রীর কাছে 'বালক ঠাকুর', বালক ব্রহ্মচারীর কথা শুনে বালক ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ছেলের অসুস্থতার কথা জানিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, ছেলের পথ্য কেনার পয়সাও আজ তাঁর কাছে নেই, এমন দুরবস্থা। নানা জনের কাছে চিকিৎসা করিয়ে আজ তিনি সর্বস্বান্ত। ছেলেকে সুস্থ করে দেবার আকুল প্রার্থনায় বালক ঠাকুরের পায়ে পড়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তার আকুল কান্নায় বালক ঠাকুরের মন ব্যথায় ভরে উঠলো। তিনি রামানন্দকে দেখতে যাবেন বললেন। সেইদিনই বিকেলে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বালক ঠাকুর টিকাটুলীর 'শ্যামাবাসে' কামিনী জজের স্ত্রীর বাড়ীতে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রায় মিনিট পনের তিনি রামানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রামানন্দের খুবই সঙ্গীন অবস্থা। হাতটি নাড়াবার শক্তিও তার নেই। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। বালক ঠাকুর তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নেহমাখা স্বরে বললেন, 'চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।' তারপর তিনি একগ্লাস জলস্পর্শ করে ওকে খাইয়ে দিলেন ও মণিকুন্তলা রায়কে বললেন, 'ওকে (রামানন্দকে) একটু ভাল খাওয়াতে হবে।' একটু ভাল হলে ওকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যেতে বললেন। তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বালক ঠাকুর চলে এলেন। এরপর রামানন্দ সুস্থ হয়ে হেঁটে বালক ঠাকুরের কাছে এসেছিল এবং তাঁর কাছে কয়েকদিন ছিল। মাসখানেকের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে, রামানন্দের সুস্থতার সংবাদ পেয়ে সেই মাতাজী বলেন, কোন্ সে ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহান যিনি রামানন্দকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিতে পারেন? এরপর তিনি বালক ঠাকুরকে দেখতে আসেন ও তাঁকে নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করেন।

এক বিখ্যাত মাতাজী বিদায় দিয়া দিছিল। এরকম আছে হাজার হাজার। আমি তো ঢোল পিটাই নাই। তবে অযথা আমার কার্যকলাপে ভ্রান্ত ধারণা করা মোটেই শোভনীয় নয়। কারে কোন্ mind-এর treatment (চিকিৎসা) করা হবে, কাকে কিভাবে করা হবে না হবে, সেটা তো ওরা জানতাছে না। তারা তাদের চোখ দিয়া দেখতাছে একরকম। কারে কিভাবে treatment করা হচ্ছে, শেষ না দেখা অবধি মন্তব্য করা চলবে না। যদি জানতে চায় জিজ্ঞাসা করতে পারে। সেটা আমি খুলে যতটা পারি, বলে দেব।

তোমরা নিজেদের মধ্যে খোঁচাখুঁচি ঝগড়া করবে না। এ একটা টিপ্পনী কাটলো, ও একটা অসম্মানসুচক কথা বললো বা খুঁচিয়ে কথা বললো, এগুলো বলা নিষেধ। তাতে ঝগড়া বাড়ে। আবার কেউ একটা কথা বললো, আরেকজন ভাবলো, আমারে বুঝি বললো। দেখা গেল, সেই মন নিয়েই সে বলে নাই। তাও তো হতে পারে। সুতরাং আগেই যেচে কাঁধে কেউ এরকম কোন কথা গ্রহণ করবে না। কেউ মনে করবে না যে, আমাকে বুঝি খোঁচা দিল, আমাকে বুঝি কথাটা বললো। আমাকে বুঝি শুনালো, সেটাও মনে নেবে না। আর হয়ে থাকলে, তোমাদের ভাবতেও হবে না। এটার ফল কিভাবে পেতে হয়, সেটাও বুঝে নেবে। **যারা আমার কাছে থাকে, যারা সংগঠনের কাজে থাকে, তাদের কার্যকলাপে তারা দোষী হলে আপনিই সরে যাবে। সুতরাং কারও ভাবতে হবে না, কিছু বলতে হবে না।** সেইসব নিয়া কেউ অযথা মাথা ঘামাবে না। অযথা চিন্তা করবে না এবং সে যাকেই বলুক, তোমাকেই বলুক, একেই বলুক, যাকেই বলুক, কেউ সেটা নিজের মাথায় নেবে না। যত তোমাকে আঘাত দিয়া কথা বলুক, টিপ্পনী দিয়া কথা বলুক, খোঁচাইয়া কথা বলুক, তুমি সবসময় মনে রাখবে, **দেবতার সান্নিধ্যে যারা আসে, দৈবজ্ঞের সান্নিধ্য যারা লাভ করে, সামান্য ভুলে যেন তারা ছিটকিয়ে না পড়ে।** এটা সবসময় মনে রাখবে। আর সামান্য কথা নিয়ে ঠাকুরকে বিব্রত করবে না। নারদের পুঁটলি চুরি গেছে। নারদ সে বেটাকে ধরে নিয়ে নারায়ণের কাছে গেছে। নারায়ণ তখন বললেন, 'নারদ, তুমি এতবড় একজন সাধক। সামান্য ব্যাপারে অরে (চোরকে) আমার কাছে নিয়া আসার দুঃসাহস

তুমি সবসময় মনে রাখবে, দেবতার সান্নিধ্যে যারা আসে, দৈবজ্ঞের সান্নিধ্য যারা লাভ করে, সামান্য ভুলে যেন তারা ছিটকিয়ে না পড়ে। এটা সবসময় মনে রাখবে।

তোমার কি করে হল? সামান্য একটা পুঁটলি চুরি করেছে। সেই পুঁটলির মায়াতে হোক, রাগেই হোক, তুমি একটা চোরকে আমার কাছে নিয়ে এলে। তুমি জান, আমার কাছে আসতে গেলে বহু সাধনা করতে হয়, জপ তপ করতে হয়। তোমার সাধনা বলে একটা সামান্য ব্যাপারে ওকে বিচার করতে টেনে আনছো আমার কাছেতে? আর সেই চোর সেই যে চোখ বুঁজলো নারায়ণের ঘরে ঢুকবার আগেতে, চোখ আর মেললো না। নারদ বললো, স্বয়ং নারায়ণ বললেন, তুই কি দোষ করেছিস্? নারদের পুঁটলিটা চুরি করেছিস্? সত্যি কি চুরি করেছিস্? তুই চোখ মেলে কথা বল না? কিন্তু সে অভাগা এমনই অভাগা, এত পাপে, অভিশপ্তে ভরা যে, কিছুতে আর চোখ খুললো না। নারায়ণ নারদকে বললেন, ''ওকে নিয়ে যাও। বিচার করবো কি? বিচার তো হয়েই গেল। চুরি তো করেছে। তুমি দেখলে। ওকে নিয়ে চলে যাও।'' তারপর সে চলে গেল। নারদ ওকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই খবর চার দিকে রটে গেল। তারপর সে (চোর) হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। এক মুচি জুতো সেলাই করছে। 'ও' (চোর) কাছ দিয়া যায়। থুঃ থুঃ থুঃ, মুচি থুথু ফেলে।

তুই চোখ মেলে কথা বল না? কিন্তু সে অভাগা এমনই অভাগা, এত পাপে, অভিশপ্তে ভরা যে, কিছুতে আর চোখ খুললো না।

— তুমি আমাকে দেখে থু থু ফেলছো কেন?

— থুথু ফেলবো না? স্বয়ং ভগবানের সান্নিধ্যে গিয়েও তোর কপালে দেবদর্শন ঘটলো না। তিনি নিজে বললেন, 'চোখ মেল। কথা বল।' চোখ মেললেই তো তোর পাপ কেটে যেত রে বেটা। যাঁর দর্শনের জন্য হাজার হাজার যোগীরা ঋষিরা কত পরিশ্রম করছে, বেটা তুই নারদের কল্যাণে তাঁর কাছে গিয়েও দর্শন পেলি না? এরকম অনেক ঘটনা আছে।

যাঁর দর্শনের জন্য হাজার যোগীরা ঋষিরা কত পরিশ্রম করছে, বেটা তুই নারদের কল্যাণে তাঁর কাছে গিয়েও দর্শন পেলি না? এরকম অনেক ঘটনা আছে।

পরিবেশে খুচরো খুচরো ঝগড়াতে, খুচরো খুচরো খোঁচাখুঁচিতে এমন সব কান্ডকীর্তি তোমাদের হয়ে যেতে পারে যে, দূরে সবাই ছিটকে যেতে পার। তোমাদের কার্যকলাপে তোমরা দূরে সরে যেতে পার গিয়া। তোমাদের মনে এরকম রাগ হয়ে গেল, চটে গেলে। হঠাৎ 'আমি যাই, আমি চললাম'।

এমন রাগ হইল, বেরিয়ে গেলা গিয়া। ঠক্‌লা। সরে পড়লা। রাগের মাত্রাটায় দেবতার সান্নিধ্য ত্যাগ করলা। রাগ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অবুঝ অজ্ঞানে যেমন মানুষকে বিভ্রান্ত করে, রাগেও মানুষকে বিভ্রান্ত করে। রাগে মানুষকে এদিক ওদিক করে দেয়। রাগের সময় কোন বুদ্ধি, পরামর্শ, ভাল কথা শুনতে ইচ্ছা হয় না, ভাল লাগে না। রাগের সময় একটা জিনিস তুমি ধারণা করলা। সেই ধারণার সাথে কথা মিললো না বলে, ঐ ধারণাকে তুমি বলবৎ করতে চাচ্ছ। ধারণাটা সত্য নয়। তুমি বলবৎ করতে যাচ্ছ। বলবৎ করতে গিয়ে হল কি, মনে কর, আমি নিজে বললাম। ঠাকুর নিজে বললেন, 'তুমি এটা ভেব না। এটা ঠিক না।' তুমি ঠাকুরের কথা উড়িয়ে দিলা। পাপে আরও ডুবলা। ঠাকুর বললেন, আমার কথাটা যখন অগ্রাহ্য করছে, যখন নিজের কথাটাই, নিজের ধারণাকেই বড় করছে, বলবৎ করছে, যাক তাকে আর কিছু বক্তব্য নাই। তাতে হল কি, রাগটা আরও বেড়ে গেল। রাগ বেড়ে যাওয়ার ফলে ছিটকিয়ে যাওয়ার মতন অনেক কারণ সৃষ্টি হয়ে পড়ে তখন। যে কোন মুহূর্ত্তে ছিটকিয়ে যেতে পারে সাধারণ ভুল বুঝাবুঝিতে। অতি ছোট বিষয় নিয়ে, কোন কারণ নাই, কিচ্ছু নাই, বিরাট কান্ড ঘটে যেতে পারে।

রাগ বেড়ে যাওয়ার ফলে ছিটকিয়ে যাওয়ার মতন অনেক কারণ সৃষ্টি হয়ে পড়ে তখন। যে কোন মুহূর্ত্তে ছিটকিয়ে যেতে পারে সাধারণ ভুল বুঝাবুঝিতে।

দুই পরিবারে ঝগড়া। মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল। হাসপাতালে গেল গিয়া। ফুটপাথে আঁকছে। একজনের ঘরের সামনে আরেকজন পায়খানা বানাইছে। রাস্তায় আঁকা দেইখাই ঝগড়া লাইগা (লেগে) গেল। আঁকা দেইখাই মাথায় বাড়ি; রক্তপাত। পুলিশ আইছে। দুইজনরেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে লইয়া গেছে। একজন বলছে, 'হুজুর, আমার বাড়ীর সামনে পায়খানা বানাইছে। আর জায়গা পায় নাই? ম্যাজিস্ট্রেট তো দেখতে (তদন্ত করতে) পাঠাইছে। সঙ্গে পুলিশ, দুই আসামীরেও পাঠাইছে। পুলিশ বাড়ী দেখতে আইছে। সত্যি সত্যি রান্নাঘরের সামনে পায়খানা বানাইছে নাকি? ওরা তো ফুটপাথ খোঁজে। কোথায় আঁকা: পুলিশ বাড়ী যেতে চায়। ওরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বলে, আঁকতা হ্যয়। এইখানে আঁকছিলাম।

পুলিশ বলে, আঁকতা হ্যয়?

তখন হুজুরের কাছে লইয়া গেছে। বাড়ীঘর কিচ্ছু নাই। ফুটপাথে আঁকছে। এই আঁকার মধ্যে এতসব গোলমাল। একজনের রান্নাঘরের সামনে আরেকজন পায়খানা আঁকছে। রান্নাঘরও আঁকা। এই আঁকার মধ্যে ফাটাফাটি।

বাড়ীঘর কিচ্ছু নাই। ফুটপাথে আঁকছে। এই আঁকার মধ্যে এতসব গোলমাল। একজনের রান্নাঘরের সামনে আরেকজন পায়খানা আঁকছে। রান্নাঘরও আঁকা। এই আঁকার মধ্যে ফাটাফাটি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, দুইজনরে ধইরা কয়েকখান দাও। দুইজনের কাছ থিকা বড় বড় দুইটা কল্‌কি বের হলো। ওদের না হয় কল্‌কির নেশা। তোমাদের নেশা হবে কি? রাগের নেশা। তোমাদের ঝাড়া দিলে রাগ বেরোবে, অজ্ঞান বেরোবে, অবুঝ বেরোবে, ভুল ধারণা করার habit-টা বেরোবে। এগুলো বেরিয়ে যাবে। সব বোঁচকা থেকে বেরোবে। তখন সবাই বুঝবে যে, এগুলো বেতাল। বেতালায় চলছে সব। বুঝতে পেরেছ? বেতালে চলছে। বেতাল থেকে তালে না এলে আর উপায় নাই, উপায় নাই। বুঝতে পেরেছ? সব নির্দেশগুলো মনে রেখে সেইভাবে চলতে চেষ্টা কর। এতক্ষণ যা বললাম, কথাগুলি মনে রেখ।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, দুইজনরে ধইরা কয়েকখান দাও। দুইজনের কাছ থিকা বড় বড় দুইটা কল্‌কি বের হলো। ওদের না হয় কল্‌কির নেশা। তোমাদের নেশা হবে কি? রাগের নেশা।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে বিবেকের পথে চলো

সুখচরধাম

২০শে জুলাই, ১৯৮৫

বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে পথ চলাই বিধেয়। সেইভাবেই তোমাদের দেহে সেই অনুভূতিসম্পন্ন চক্ষু রয়েছে। তোমরা যাতে অনুভব করতে পার, উপলব্ধি করতে পার; উপলব্ধি করার জন্য যে সাহায্য সহযোগিতা দরকার, সেইভাবে সেইরকম ভাবে এই দেহবীণাযন্ত্রে সবকিছু setting (সাজানো) হয়ে রয়েছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই কেউ কারও থেকে কম নয়। জিহ্বায় যে স্বাদ, স্পর্শে যে স্বাদ, ঘ্রাণে যে স্বাদ, দর্শনে যে স্বাদ, শ্রবণে যে স্বাদ, অনুভুতিতে সেই স্বাদ। এইভাবে এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি স্বাদের জিহ্বা (যন্ত্র)। প্রতিটি ইন্দ্রিয়েই স্বাদের যে অনুভূতি, কেউ কারও চেয়ে কম নয়। প্রত্যেকে সমতুল্য। জোনাকির আলোও আলো, সূর্যের আলোও আলো। আবার Day-light-এর আলোও আলো। সব আলো সমতুল্য। ছোট বড়তে আসে যায় না।

ধ্যান, ধারণা, যোগ, তপ, এইটাই হইল একমাত্র সাধনা। এইটাই হইল সাধনা, এইটাই ধ্যান। **বিবেকের সাথে হাত মিলানোই ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম, জপ। আর কোন পাহাড়-পর্বতে, বনে জঙ্গলে যে যেখানে হাত মিলাতে চাইছে, এই একই জায়গায় হাত মিলাতে হবে।** যে যেভাবেই যাক, যতরকমভাবে খুশী যে পথ দিয়েই যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। কে কোন্ পথ দিয়ে যাবে, কোন্ মত দিয়ে যাবে, বিবেক সেটা দেখবে না।

বিবেক বলছে, 'আমি দেখবো, আমার সাথে হাত মিলিয়ে আছে কি না। এইটাই যথেষ্ট।' সুতরাং তার সাথে হাত মিলিয়ে আসতে গেলে বিবেক জানে কোন্ পথ দিয়ে, কোন মত দিয়ে আসতে হয়। বিবেক সে ব্যাপারে খুব ওয়াকিবহাল। সুতরাং বিবেককে আর বলতে হবে না, তুমি এই পথ দিয়া আস অথবা ঐ পথ দিয়া যাও। বিবেক বলেই দিচ্ছে, ''তুমি সেই পথ (ন্যায়ের পথ) দিয়া আমার কাছে আস। আমি হাত বাড়িয়ে বসে আছি। আমি তোমার জন্য কোল পেতে বসে আছি। তুমি আমার কাছে আস। আমার স্তন পান কর। আমি তোমার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি। আর আমার কোন বক্তব্য নাই''। সুতরাং তোমরা বিবেকের সাথে হাত মিলাও।

বিবেকের মত এত সহজ, এত সুন্দর মত পথ আর কিছু নাই এইটাই হইল জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। সাধনার পথে, জানার পথে দেবতা ব'লে, ভগবান ব'লে যাহা বলা হয়, সেই দেবতাকে, ভগবানকে যদি অনুভব করতে চাও, অনুভুতিতে আনতে চাও, অন্তরের সাথে যদি মিশে থাকতে চাও, বিবেকের খুশীতে হাত মিলাও। ভগবদ্‌দর্শনে যে মহানন্দের কথা বলা হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাবে বিবেকের সাথে মিশে থাকলে। তিনিই একমাত্র মহান্, তিনিই একমাত্র অবতার, তিনিই একমাত্র সত্যবাদী যিনি বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে বিবেকের স্তন পান করে আছেন। তিনিই একমাত্র সত্যবাদী।

তোমরা যদি তত্ত্ব লেখ, কোন বই লেখ যাই কর, আমার মত পথ আদর্শ, আমার যা কিছু আদেশ নির্দেশ যদি প্রকাশ করতে চাও, এই বিবেকের উপর দৃষ্টি রেখে সব কাজ করবে। সেইভাবে তোমরা চলার পথে সবকিছু করবে। তবেই হবে আমার সত্যিকারের আদর্শ অনুযায়ী পথ চলা। আমার আদর্শই হল বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করা। যত বাধা আসুক, বিঘ্ন আসুক, যত ঝড়-ঝাপটা আসুক বিবেকের পথে চলবে। বিবেক একথা বলছে, সবকিছুর মধ্যেই তুমি আনন্দ পাবে, যতক্ষণ তুমি আমার সাথে মিশে আছ। এই ক্ষেত্রে এই বাস্তবের ক্ষেত্রে অনেক বাধা আসতে পারে, অসুবিধা হতে পারে। কারণ সবাইতো বিবেকাধীন নয়। আমার সজাগের দৃষ্টি থেকে আমি তো কাউকে বঞ্চিত করিনি। আমি তো

কোন ত্রুটি করিনি। যত বাধা আসুক, যত ঝঞ্ঝাটই আসুক, যা কিছু আসুক, মৃত্যুকে রেখেছি শেষ সীমানায়। এইজন্যই মৃত্যুকে শেষ সীমানায় রেখে তোমাদের আমি এই কথাগুলো বলছি। সুতরাং মৃত্যু যখন তোমাদের শেষ সীমারেখায় রয়েছে, জন্ম থেকে এই পর্যন্ত, এই সীমারেখা পর্যন্ত তোমরা আমার হাত ছাড়া, আমার প্রেম ছাড়া চলবে না। আমার স্তন পান ছাড়া তোমরা অন্য কোথাও মনোনিবেশ করবে না না না।

এরপরে আর কোন প্রশ্ন থাকে? আমি কি করে করবো? কেমন করে করবো? মন বসে না। মন আমার চঞ্চল। এসব কথার কোন প্রয়োজন আছে? এইটাই তো বড় কথা, এইটাই যথেষ্ট। আমার ম্যাথমেটিক্সের ভুলটা যদি আমি ধরে নিতে পারি, আমার যন্ত্র কোথায় বিকল, যদি আমি ধরে নিতে পারি, এরচেয়ে বড় কথা আর কি আছে, বল? আমার ইংরেজী লেখার ভুল যদি আমি বুঝতে পারি, বাংলা লেখার ভুল যদি আমি ধরতে পারি, আমার অঙ্ক শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, আমার যন্ত্র ঠিক কি বিকল, এসব যদি আমি ঠিক ঠিক ভাবে ধরতে পারি, তাহলেই তো হয়ে গেল। তোমার জীবনের চলার পথে, গতির দিকটায় কোথায় ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি কোথায় যদি তুমি ধরে নিতে পারো, এরচেয়ে বড় দান, বড় শিক্ষণীয় আর কিছু আছে? যিনি এই কাজে সদাই সাহায্যকারী, তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ, চিরযুগের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কৃতজ্ঞ কথাটা ছোট কথা। আমাদের ব্যাবহারিক কথা। কার কাছে কৃতজ্ঞ? তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করা যায়? না, বড় করা যায়? আমরা ভাষায় ব্যক্ত করলাম মাত্র। সুতরাং আমরা সবসময় আমাদের ভুলটা যখন বুঝতে পারছি, আমাদের যন্ত্রপাতি বিকল যখন বুঝতে পারছি, এর চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে? তিনিইতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি কাকে বলবো? যিনি ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ ব্যক্তি, বিচক্ষণ ব্যক্তি। Educationist যে বলে, কাকে বলে? যিনি ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দিতে পারেন, বুঝিয়ে দিতে পারেন, কোথায় কি পার্থক্য বলে দিতে পারেন, তিনিই Educationist. এতবড় একজন Educationist নিয়ে বসে রয়েছি আমরা, যিনি সবসময় ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের সাথে মিশে রয়েছেন। আমরাই তো বলছি বিবেকের কথা। বিবেক নিজে

তো কিছু বলছেন না, এমনই চমৎকার। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের সাথে মিশে আমাদের ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দিচ্ছেন, ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দিচ্ছেন এবং rectification-এর জন্য পথ বাতলিয়ে দিচ্ছেন। তারপরেও যদি বলো, 'মন তো মানে না, মন তো বোঝে না, কি করে হবে? কেমন করে হবে? এরপরেও তো আমরা খারাপের দিকে যাচ্ছি, অশান্তি করছি', তাহলে কি করে হবে? নিজের নিজের ত্রুটিগুলি, এই ত্রুটিগুলি বুঝতে তো পারছো। বুঝতে যখন পারছো, সেখানে তো আর কোন বক্তব্য নাই।

বাচ্চা জলে পড়েছে, বুঝতে তো পারছো। তাকে তোলার চেষ্টা তো করতে হবে। তুমি এক হাতে পারছো না। এক হাত অবশ। আরেকটা হাতেই চেষ্টা করতে হবে। আরেকটা হাতওতো তোমার হাত। আরেকটা হাতওতো তুমিই কাজে লাগাচ্ছো। আরেকজনকে তো ডাকছো। বিড়াল পড়লো কুয়াতে। তুমি নামতে পারলে না। ঝুড়ি দিলে, দড়ি দিলে। তুমি লোকজনকে ডাকলে, তোলার ব্যবস্থা করলে। তুমিই তো করলে। সুতরাং দেখতে তো পাচ্ছ, তুমি না পার, আরেকজনকে ডেকে ব্যবস্থা করো। তাও যদি না করো, তাহলে তো ভুগতেই হবে। বুঝে শুনে যদি না করো, এর আর কোন ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই। বিবেক বলছে, ''যদি না বুঝতা, না জানতা, তাহলে একটা কথা ছিল। **বুঝে শুনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তুমি ভুল করে যাচ্ছ।" একটা মুহূর্ত্তের লক্ষভাগের fraction করে যে ভাগ হবে, সেই ভাগে পর্যন্ত বলে দিচ্ছে। সেখানে এড়াবার কোন কথা নাই।**

ব্যক্তি অনেক আছে। সজাগ করে দেওয়ার ব্যক্তি, প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সজাগ করে দেবার ব্যক্তি বিরল। এই পৃথিবীতে বিরল। আবার প্রত্যেকেই সজাগ। তবু তার ভিতরে সজাগ করে দিচ্ছে। মা যেমন তার সন্তানের প্রতি সদা সতর্ক (সজাগ) দৃষ্টি রাখছে, ঠিক তেমনই। প্রত্যেকের ভিতরেই মায়ের গুণটা আছে। হয় না, হয়ে ওঠে না। মায়ের মত সকলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা কি যায়? পারে না। পারলেও করে না। সেটাও আবার ভিতরে ভিতরে বলে যাচ্ছে। বিবেক ওয়ার্ণিং দিচ্ছে। আমরা যা করছি, সেবা, শুশ্রূষা, ভালবাসা, কাজকর্ম সবকিছুর ভিতর দিয়ে বিবেকের সুর ফুটে বেরোচ্ছে। অগাধ স্নেহ, মমতা, ভালবাসা দিয়ে, আমার বিবেক

তোমার বিবেক দিয়ে আমি সবাইকে টেনে নেবার চেষ্টা করছি, বিবেকের সুরে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। বিবেকের ফর্মূলা, preperation-এর ফর্মূলা, ground ফর্মূলা। এমন ফর্মূলা আর আছে? জাজ্জ্বল্যমান জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদের জীবন গড়ার পক্ষে এমন সুন্দর ফর্মূলা রয়েছে। এই ফর্মূলা সবাই জানে। তবু ফর্মূলাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। এই ফর্মূলা জীবনগঠনের পক্ষে যে কত সুন্দর এবং এরফলে মানুষের জীবনের ধারা সর্বদিকে শান্তিপূর্ণভাবে চলতে পারে। সেখানে আর আলাদা করে তোমরা এক হও, একত্রিত হও বলার প্রয়োজন হবে না। বিবেকের এই ফর্মূলায় যারা চলবে, এই ফর্মূলায় যারা Maths করবে, তাদের বাস্তব জীবনের সমস্ত পথের ধারায় যেসব সমস্যা আসবে, সব সমস্যার সমাধান আপনি হয়ে যাবে। জীবনের চলার পথে যেসব side আছে যেমন economical-side, আর কি কি side আছে বলো তো? educational-side, সব side-এর নাম আমি বলতে পারলাম না। বিভিন্ন side যেগুলো আজ সমাজের সমস্যার side, সেই সব side-গুলোর সমাধান অতি সুন্দরভাবে হতে পারে যদি এই বিবেকের ফর্মূলাটা মানুষ ভাল করে follow করে। তাহলে আর এখানকার কোন problem থাকা উচিত নয়। আমাদের problem (সমস্যা) সবসময়ই থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মনের দিক থেকে, বাইরের দিক থেকে, সবদিক থেকেই অনেক সুরাহা হয়ে যায়, যদি এই ফর্মূলা অনুযায়ী মানুষ চলে। কারণ আজকে ফর্মূলাইতো নাই। ফর্মূলা কোথায়? ফ্লাইং (flying) কথায় মানুষ চলতে পারে না। একেকজনের উপদেশ, একেকজনের হিতকথা মানুষ মেনে নিতে পারে না। Solid একটা ফর্মূলা থাকা দরকার। একটা Natural Instinct-এর ফর্মূলা; এই Instinct-এর Instrument-টা, harmony-টা যে বাজাতে পারবে, তার মাঝে আপনিই বিবেকের গান ভেসে উঠবে, জয়ের গান ভেসে উঠবে। সেই গানের সুরে সুর মিলিয়ে সবাই এক স্বরে সুর দিলে জীবনের জয়গান আপনিই ফুটে বার হবে। এরচেয়ে আনন্দ আর কি থাকতে পারে?

আমার যখন ১৫ বছর বয়স অনেক দূর দূর থেকে লোক আসতো আমার কাছে। তাদের বলেছি, দ্যাখ, আমি কি জানি আর সেটা কতদূর

পর্যন্ত জানি, তার মাপকাঠি আমার কাছে নেই। তবে এইটুকুনু মনে রেখো, আমি এইটুকুনু জানি যে, সব গ্রন্থ চিপে রস বার করে আনলেও দেখবে যে, আমার জানার মধ্যেই রয়েছে। গ্রন্থ চিপে যদি রস বার করে, তবে আমি যা বলছি, তাতে রস আরও বেশীই পাবে, তুমি মনে করো। কমতি হবে না। গ্রন্থে বেশী পাও আর কম পাও, আমার জানায় কমতি হবে না। কিন্তু কোন ভাষার সাথে আমার যোগাযোগ নাই। তবে বিবেকের সুরে যারা সত্যিকারের ভরপুর হয়ে থাকেন, এই পৃথিবীর কোন বাধার কাছেই তারা হার মানেন না। বহুবছর আগে দুর্গম দুর্গম জায়গা থেকে পথচারীরা কত কষ্ট করে ৩০ মাইল, ৪০ মাইল, ৫০ মাইল পথ ভেঙে ভেঙে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে পাহাড়ের চড়াই উতরাই পেরিয়ে, গাছ বেয়ে বেয়ে, হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তারা শুধু পিপাসুর মতো চাতক পাখীর মতো তত্ত্বের রসের স্বাদ, বিবেকের সুরের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য ছুটে আসতো।

এখানে তো অনেক নেশাই আছে। নেশাগ্রস্ত যারা নেশার সময় তাদের টাকা পয়সা, আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ কোন কিছুর কথাই মনে থাকে না সব ভুলে গিয়ে নেশার টানে, নেশা পান না করা অবধি তারা হাতড়াতে থাকে, হাতড়াতেই থাকে। কিন্তু **তত্ত্বের নেশায়, বিবেকের সুরের নেশায় মানুষ যখন সত্যিকারের উন্মাদ হয়, সেই উন্মাদনা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, মানুষকে বিব্রত করে না।** ঐ উন্মাদনায় মানুষ নিজের ভিতরে নিজে তন্ময় হয়ে যখন হাতড়াতে হাতড়াতে পাহাড়-পর্বত, হিংস্র জীবজন্তু ও বিস্তর বাধাবিঘ্ন পার হয়ে একটু তত্ত্বরস পান করার জন্য সেইসব বিবেক সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাছে ছুটে এসে বলে, 'বাবা, একটু তত্ত্বরস দাও। একটু পানীয় বস্তু দাও,' তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যেইভাবে যে সুর দিয়ে যেইরস দান করেন তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিদের, তারা ভরপুর হয়ে আত্মহারা হয়ে সেই পথের ক্লান্তি ভয়ভীতি ভুলে আবার সংসারের কাজে চলে যায়।

আমি সেই ১৫/১৬ বছর বয়সে বলেছিলাম, দেখ **তোমরা রোগ, শোক, ব্যথা বেদনা, আরও কত কিছুর মধ্যে আমাকে জড়িয়ে আমার অমূল্য সময় নষ্ট করছো। এগুলো জোড়া তো কখনই লাগে না। সমূহ না হয় একটু তৃপ্তি দিলাম, কিন্তু এর মুল্য তো কিছুই নয়।** আমি যার

জন্য বসে আছি, সেই খনির (তত্ত্বের) বিষয়বস্তু নিয়ে আমি বসে আছি, সেই তত্ত্বের খনির আমি একজন সাধারণ কর্মী। সেই খনির বিষয়বস্তু আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। আমি চাই তোমরা তার স্বাদ গ্রহণ করো। তোমাদের এত দুঃখ, এত ব্যথা এবং এই বিষয়বস্তুকে (বিবেককে) যদি তোমরা অন্তরে অন্তরে নিয়ে নিতে পারো, দেখবে, তোমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এগুলো সব নগণ্য হয়ে যাবে। এগুলোর দাম তোমাদের কাছে কিছুই থাকবে না। সুতরাং **তোমরা এত সহজে আমাকে পাচ্ছ, হেলায় হারিয়ে ফেলো না। আমি সহজে তোমাদের অমূল্য জিনিস দিতে চাই। তোমরা কিছু নাও। আমি খনির থেকে মণি (তত্ত্ব) তুলে ধরছি। আমি খনির সাধারণ কর্মী। আমি মালিক হিসাবে কথা বলছি না। কর্মী হিসাবেই কথা বলছি।**

তাই তোমাদের কাছে আবার বলছি, অযথা সময় নষ্ট করো না। আমার সময় অযথা নষ্ট না করে যদি কিছু নেওয়ার থাকে নিয়ে নাও। আমি যেটুকুনু নিয়ে বসে আছি, সেইটুকুনু যদি নেও, মনে হয়, এই সমাজজীবনে বাস্তবজীবনে চলার পথে যাহা পেলে তোমরা মনে করো, সমস্যার সমাধান হবে, তার চেয়েও বেশী পেয়ে যাবে। তোমাদের জীবনে আরও বেশী সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি। তোমরা এখন নিচ্ছ না, বুঝতে পারছো না। একবার নিয়ে নাও, তাহলেই বুঝতে পারবে। তাই বলছি, নিয়ে নাও। বিবেকের সুরটি মনে গেঁথে নাও। সময় নষ্ট করবে না। সময় হারাবে না। নিজের একটা কথা বললাম, এমনি।

তোমাদের তো সেই তত্ত্বপিপাসুদের মতো পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে আমার কাছে আসতে হয়নি, বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি। সহজে সুলভে যেটা পাচ্ছ, সেটা অবজ্ঞা অবহেলায় নষ্ট করা কি উচিত? সেটা উচিত কাজ বলে আমি মনে করি না। প্রত্যেকেই বলে, solid একটা কিছু চাই; solidity চাই। আমি একটা কথায় বলতে পারি না। আমাকে অনেক কথায় বলতে হয়। আমি গেঁয়ো মানুষ, ভাষা জানি না। সুতরাং আমি বলে যাব। তার থেকে বেছে বুঝে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশনটা তোমরা করবে। তোমরা পরিবেশন করবে। আমি রান্না করতে

পারি। পরিবেশনটা তোমাদের কাজ। আমি মাটি কাটা লোক। স্রেফ মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক। ওরা (তত্ত্বপিপাসু, জ্ঞানপিপাসুরা) এত পরিশ্রম করে আমাদের কাছে আসতো। ওদের পরিশ্রমটা আমার প্রাণে বাজতো। তোমরা এত সহজে পাচ্ছ। এত কাছে আমাকে পেয়ে তার মূল্য দিতে পারছো না। সামনে ঘুরতে পাও, পিছনে ঘুরতে পাও আমাকে। সব কিছু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। নিজের কথা কত বলবো আর? বলা কি উচিত? নিজের কথা বললে যেন কেমন কেমন লাগে। কত সুন্দরভাবে তোমরা নিতে পার। কত সুন্দরভাবে তোমরা তৈরী হতে পার। একেকজন একেবারে 'জুয়েল' হয়ে যেতে পার।

সুরে তানে লয়ে মাত্রায় একটি কথার কত বিশ্লেষণ আছে। এক কথায় কত দৃষ্টান্ত আছে। একই কথা কতভাবে বলা হচ্ছে। এই দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে কতভাবে কত কিছু বলে দিয়ে যাচ্ছে। কতদিকে কতরকম হয়ে যাচ্ছে। একটা কথা, এক ধরণের কথা, কোটি কথা হয়ে যাচ্ছে, fraction হয়ে যাচ্ছে। আরও বাড়াচ্ছে। আরও Mathematical way-তে চলছে। আরও বেশী বেশী চলছে। ফর্মূলাটা হচ্ছে বড়ো। তাই তোমরা সেইভাবেই চলবে। তোমরা যখন সঙ্গী হয়েছ, তোমরা যখন সঙ্গী হয়ে সেই সঙ্গীতে চলছো, সেই সঙ্গীতের সঙ্গী হয়ে আছ, পারবে না কেন? ইঞ্জেক্সন দিয়ে তো বিবেক বুঝানো হচ্ছে না। ভরপুর হয়ে রয়েছ প্রত্যেকে। সুতরাং ভাববার তো কিছু নেই।

এই কথাগুলো যদি আবিষ্কার না হতো, জানতে পারতে না। আবিষ্কার হওয়াতে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। এরচেয়ে আরও অনেক অসম্ভব সম্ভবে আসবে। মানুষকে অবাক করে দেবে। অবাক হবার কিছু নেই। প্রকৃতির জগতে যাহা সত্য, তাহাই বের হবে। কেউ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। কেউ ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারবে না, যাহা এখন চলে আসছে। কোটি কোটি generation চলে গেছে। সেটা কোন কথা নয়। যারা চিন্তাশীল ব্যক্তি, বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে যারা সুরে ডুবে গেছেন, তাঁরা কেন বুঝতে পারেন? কেন তাঁদের clear conception হয়? কারণ ভিতরের gland গুলো তাঁদের ফুটে যায়। ভিতরের gland-গুলো ফুটে যাওয়ার ফলে এই

জগতের মানুষের চরিত্রটা তাঁদের কাছে ফুটে ওঠে মাইক্রোস্কোপের মতো। ঐ বিবেকের যন্ত্র যত ফুটবে, microscopic ধারাটা ততবেশী পরিষ্কার হয়ে যাবে। মানুষ এক গ্লাস জল খেতে পারবে না যদি মাইক্রোস্কোপ (microscope) দিয়ে দেখে। তাহলে দেখবে, জলের ভিতরে কিলিবিলি করছে সব পোকারা। কেউ কিছু খেতে পারবে না। বাতাসের মধ্যেও তাই। বাতাসের মধ্যে দেখবে, কত জীবাণু। প্রশ্বাসের সাথে সাথে কত পোকামাকড় টানছে, দেখলে সব আশ্চর্য হয়ে যাবে। Microscope (মাইক্রোস্কোপ) দিয়ে দেখলে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে। **ঠিক এমনই মাইক্রোস্কোপের মত এমন যন্ত্র আসবে, যেই যন্ত্র সব clear করে দেবে। বিবেক তারই প্রতীক্ষায় আছে।** বিবেক ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। বিবেক ক্রমশঃই প্রকাশ হচ্ছে। বিবেক ক্রমশঃই প্রকাশ করছে। প্রকাশ করতে করতে এমন প্রকাশ করবে যে, সবার চরিত্র প্রকাশ করে দেবে। অসুবিধা কিছু নেই। তোমরা এখন বোঝ ধারণায়। কথায় বার্তায় চলায় ফেরায় অনেকটা বুঝতে পার একেকজনের চরিত্র। তাহলে দেখা যায়, তুমি কিছুটা বুঝতে পার। সেই বুঝটাকেই যদি আরও কোটি গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে কেন তুমি আরও বুঝতে পারবে না? একটা লোহার জিনিস হাত দিয়ে ছুঁড়ে কিছুটা দূরে ফেলতে পার, সেই লোহার বুলেটকে যদি গানের (বন্দুকের) মধ্য দিয়ে চালাও, তবে দেখা যায়, সেটা মাইলখানেক দূরে চলে গেল। তোমার বুঝ আছে। একজনকে দেখলে বুঝতে পারো। কারও চেহারা দেখলে বুঝতে পারো, সে শান্তিতে আছে, না অশান্তিতে আছে? সে ব্যথায় আছে, না দুঃখে আছে, দেখলে বুঝতে পারো না? বলো না, 'আপনার মনটা খারাপ মনে হচ্ছে, কি হয়েছে ব্যাপারটা?' সে হয়তো তখন এক অশান্তির ঘটনা বললো। তাহলে বুঝা যায়। জিজ্ঞাসা না করেও তার হাবভাবে, তার movements-এর উপরে, তার গতির উপরে, তার চলার উপরে, তার ভঙ্গিমার উপরে কিছুটা অন্ততঃ বুঝতে পারছো। সেই **বুঝটাকেই যদি ১ কোটি, ২ কোটি voltage (ভোল্টেজ) বাড়িয়ে দাও, তাহলে আরও বেশী বুঝতে পারবে। প্রকৃতির একটা নিয়ম হলো, প্রকৃতির একটা ফর্মূলা হলো যে, একটা বুঝ যদি কারও মধ্যে থাকে, তবে কোটি বুঝ তার মধ্যে আছে।**

ভাস্কো-ডা-গামার সাঙ্গপাঙ্গরা পাগল হয়ে যাচ্ছিল। যখন তার রসদ ফুরিয়ে আসছিল, সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে আশার আলো পেল, যখন একটা nest (পাখীর বাসা) ভেসে যেতে দেখলো। তখন তার সঙ্গীরাও আশার আলো পেলো, সব দুঃখ ব্যথা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেল। তোমাদের ভিতরেও যে nest, যে পাখীর বাসা ভেসে আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমাদের সজাগ করে দিচ্ছে বিবেক। বুঝবার অধিকার তোমাদের আছে। অনন্ত সুরে অনন্ত বুঝ। সেই বুঝে বুঝদার হওয়ার অধিকার তোমাদের আছে। এই বুঝটুকুনু তোমাদের সাথের সাথী হয়ে আছে। এই বুঝটুকুনু যথেষ্ট বিশ্বের বুঝকে বুঝার পক্ষে। তারই চর্চা, তারই গণিতের চর্চা হলো সাধনা।

সাধনা কোথায়? ধ্যান-ধারণা কোথায়? এই প্রকৃতির গণিতের সাধনায় যাঁরা তন্ময় হয়ে আছেন, তাঁরাই হলেন বিচক্ষণ, তাঁরাই হলেন গণিতজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, সুরজ্ঞ। তাছাড়া অন্য কাউকে এই উপাধি দেওয়া চলে না। এই এতবড় উপাধি অন্য কারও প্রাপ্য নয়। এটাই science, যেখানে বাস্তব সত্য রয়েছে, Practical side রয়েছে, তা দিয়েই science তৈরী হয়, গঠনমূলক কাজ হয়। এখানে impractical কোন কথা নাই। গণিতের গণনায় আমরা যা কিছু করবো ১, ২ থেকে ৯ কে নিয়ে। তারপর শূন্যকে আশ্রয় করি। ১, ২ থেকেই শুরু করি। এই ৯-এর ঘর, আর শূন্য দিয়ে দশের ঘর। এই সংখ্যা দিয়ে আমরা অগণিত সংখ্যায় এগিয়ে যেতে পারি। ১ থেকে ৯; মাত্র নয়টি সংখ্যা, তারপর শূন্য। অগণিত সংখ্যায়, অনন্ত জীবনের সংখ্যায় যদি তুমি যেতে চাও, এই সংখ্যা কোনদিনই আর শেষ হবে না। এই নয়টি মাত্র সংখ্যা। আমাদের জীবনের কয়েকটি মাত্র সংখ্যা। এই অনন্ত জীবনের, যেখানে বিশ্বের অনন্ত রহস্যের শেষ নাই, সীমা নাই তাকেও সংখ্যায় আনা চলে, তোমাদের এই কয়টি সংখ্যা দিয়ে। গণিতে এটাই আশ্চর্য। তোমাদের বাইরে হাতড়াবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। হাতে হাত দাও। এখানে (বিবেকের সাথে) হাত মিলাও। এখানে হাতে হাত দাও। তবেই সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে। সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। দূরে নয়, দূর দেশে নয়। এত কাছে, এত নিকটে যে ভাষায় ব্যক্ত করা

চলে না। তবু **মানুষ আজ দিশাহারা। কারণ মানুষ এমন সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত মানুষ আজ দিশেহারা। দিশে না আসলেই দিশেহারা। আজ সেই অবস্থাই চলছে। আজ সেই দিশেরই অভাব।**

যখনই স্বার্থের গন্ধ আসে, একাধিপত্য একনায়কত্ব আসে, যখনই স্বার্থের বেশী প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছা হয়, তখনই এইগুলি (বিবেক-বিরোধী কাজ) শুরু হয়। প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়েই এইগুলি হয়। স্বাধীন দান এর মধ্যে রয়েছে। স্বাধীন ব্যবহার এরমধ্যে আছে। এই স্বাধীন দানকে এইভাবে অপব্যবহার করে আমরা নিজেকেও বিভ্রান্ত করছি, সমাজকেও বিভ্রান্ত করছি। কোন রাজনীতি, ধর্মনীতিকে এখানে (এই পৃথিবীতে) ভাগ করা চলে না। কোন নীতিগত বিবাদ এখানে চলে না, চলতে পারে না। যারা ভাগ করেছে, বৈষম্য করার জন্যই করেছে, আলাদা করার জন্যই করেছে। এটা কোন মহৎ কাজ করেনি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এগুলো মহৎকাজের লক্ষণ নয়, পরিষ্কার কথা।

প্রকৃতিই সবকিছু করাচ্ছে, অনেকে বলে। এই করার ভিতরে এটাই হ'ল বিশেষত্ব যে তোমার করার স্বাধীনতাটা প্রকৃতি তোমার হস্তে অর্পণ করে দিয়েছে। ইচ্ছা করলে তুমি বসতে পারো। ইচ্ছা করলে তুমি দাঁড়াতে পারো, ইচ্ছা করলে তুমি শুয়েও থাকতে পারো। এই স্বাধীনতাটা তোমার হাতে ন্যস্ত আছে বলেই তোমার করণীয় আছে অনেক। তোমার চোখ, মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি তোমায় দিয়েছে। তুমি দেখে দেখে চলো। বুঝে বুঝে চলো। একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে চলো। নিজে রক্ষা পাও, অন্যকে রক্ষা করো। এই স্বাধীনতা তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারো। সুতরাং তোমরা এইটুকুনু মনে কোর না যে, তোমাদের ভাগ্যে রয়েছে, কপালে রয়েছে, অদৃষ্টে লেখা রয়েছে বলেই তোমাদের এই করতে হবে বা পরিণতিতে এই হবে। এরজন্য এই স্বাধীনতা নয়।

প্রকৃতি বলছেন যে, আমার তরফ থেকে এইটুকুনু স্বাধীনতা তোমাদের

দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গুলির বিভিন্ন ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন আমার এইসব সাহায্য সহযোগিতা, সুযোগ সুবিধা নিয়ে যে সঠিক পথ তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হলো, যে বিবেকের পথ তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হলো, সেই পথই তোমাদের পথ। সেটাও তোমাদের arrow-mark দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোমাদের স্বাধীন চিন্তা বা বুদ্ধি, যেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে ব্যতিক্রম যদি করো, তারজন্য দায়ী তোমরা। সেই ব্যতিক্রমের বুদ্ধিও আমারই (প্রকৃতিরই) দান। কিন্তু তুমি যদি ব্যতিক্রমের পথেই নিজেকে নিয়োজিত করো, তার ফল তোমাকে ভুগতেই হবে। চলার পথের স্বাধীনতা তোমার হাতে অর্পণ করা হয়েছে বলেই, যেভাবে খুশী চলার স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। সবটাই আমার দান। সবটাই ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা তোমার হস্তে। কিন্তু কোন্ দিকে তোমার যেতে হবে, কোন্ পথে চলতে হবে, সেগুলিও আমারই দেওয়া। তুমিই এখন বেছে নাও, জেনে নাও, তোমার কি কর্ত্তব্য।

তোমার কি কর্ত্তব্য, সেটাও তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে চলতে হবে, সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও যদি আমার এই স্বাধীন দানের মর্যাদা না দাও, আমার (প্রকৃতির) দানের মর্যাদা নষ্ট করো, তারজন্য দায়ী তোমরা। কারণ আমার দেওয়া স্বাধীনতা নিয়ে তোমরা কি করলে? তোমরা অপব্যবহার করলে। সুতরাং এটা মনে কোর না, অপব্যবহার যে করলাম, এটা তোমারই (প্রকৃতিরই) ইচ্ছাতে হয়েছে। সেটা ঠিকই, সেখানেও আমার (প্রকৃতির) ইচ্ছা তোমার মধ্যে রয়েছে। সেই ইচ্ছাতে তুমি হাত দিয়ে দেখ। কোন্ ইচ্ছাটা করলে তোমার পক্ষে শুভ হবে, সেই বুদ্ধিও তোমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন তোমার বুঝে নিতে হবে, কোন্ ইচ্ছার পথে গেলে, কোন্ ইচ্ছাটা নিজের জীবনে ব্যবহার করলে প্রকৃতির ইচ্ছার সাথে যুক্ত হওয়া যায়। সেটাও তোমার বুদ্ধিতেই রয়েছে। এখন তুমি সুন্দরভাবে প্রকৃতির দানকে ব্যবহার করে, নিজের চিন্তাকে সেইদিকে রেখে, সেইভাবে সুন্দর বুদ্ধিতে চলো। চলবে এইভাবে। বুঝতে পেরেছ?

প্রত্যেকেরই নিজের ভিতরে সবকিছু করার বুদ্ধি রয়েছে। তোমরা রাগ করছো, অন্যায় করছো, অন্যায় বুদ্ধিতে মেজাজ করছো, অপরাধের দিকে মন যাচ্ছে, সবটাই ঠিকই। সবটাই প্রকৃতির দান। সবটাই রয়েছে তোমার ভিতরে। তোমার চলার গতি রয়েছে যেদিকে, তুমি সেদিকেই যাও তোমার ইচ্ছাতে। তোমার হাতে driving (stearing) ইচ্ছা করলে গাছে ধাক্কা লাগাতে পারো, দেওয়ালে আঘাত লাগাতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে ডোবাতে ফেলে দিতে পার। কিন্তু সেই ইচ্ছা আছে বলেই কি সেই ইচ্ছাই করবে? না, যে সহজ রাস্তা তোমার রয়েছে, সেই দিকে যাবে? ইচ্ছা করলে তুমি বেঁচে যেতেও পার, বাঁচাতেও পার। কোন্ পথ অবলম্বন করলে, কোন্ পথ ধরে চললে তোমার ভাল হবে, সেটা নিজে বিবেচনা করে সেইভাবে সেই কাজ তুমি করবে। যেটা করা তোমার উচিত তাই করবে। কারণ সেই উচিত বুদ্ধিটাও আমারই (প্রকৃতির) দান। সবগুলো ইচ্ছাকে সবকিছুকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোমার ভিতরে তোমার বাইরে চারিদিকে রেখে দেওয়া হয়েছে। **জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকৃতি তোমাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য, নিজেকে নিজে চালিয়ে নেওয়ার জন্য এবং অন্যকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য এমন সব বিষয়বস্তু তোমার সম্মুখে রেখেছে যে, যার থেকে বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে চলার অনেক বিষয়বস্তু তুমি পাবে।** ইচ্ছা করলে তুমি সেইভাবে চলতে পারো। সেই স্বাধীনতা তোমাকে অর্পণ করা হয়েছে। আমি (বিবেক) শুধু অপেক্ষা করছি, কবে তুমি আমার সাথে হাত মিলাবে।

মহাকাশ নিজেকে নিজে প্রকাশ করছেন জীবের ভিতর দিয়ে। তিনি সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজেকে নিজে প্রকাশ করছেন। যখনই প্রকাশ করার ইচ্ছা জাগবে, তখনই বুঝতে হবে, তখনই ভাববে, সবকিছু ইচ্ছাকে একত্র করেই প্রকাশ করছেন। কারণ তা হলেই কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা সত্য, কোন্টা অসত্য, সবগুলো বিবেচনার কথাটা তখনই প্রকাশিত হবে। বিবেচনার বিষয়বস্তুর সম্মুখীন না হলে বিবেচনার কাজটাকে তুমি সুন্দরভাবে লাগাতে পারবে না। যদি বলা হয়, বিবেকটা কি? বিবেচনাটা কি? সুতরাং বিবেকটা বিবেচনাটা সম্বন্ধে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সবকিছু আবর্জনা সবকিছু ত্রুটির থেকে মন্দের থেকে বিবেক তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে। জীবনের

পথে যেটা ত্রুটিমূলক কাজ, যেটার দিকে জীবনে না গেলেও চলে, সে বিষয়ে তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত্তে নিজের ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে তুমি সচেতন হয়ে রয়েছ। এই যে ভালমন্দ বিচার করার বুদ্ধি, এটাই বিবেক। এই বিবেক সম্বন্ধে তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতে না, যদি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য এই সবগুলি না থাকতো। এই সবগুলি আছে বলিয়াই বিবেক সম্বন্ধে তুমি সচেতন হয়েছ। বিবেক কি? বিচার কি? জ্ঞান কি? যদি এই সবগুলি নাই থাকতো, তাহলে সৃষ্টির যে value, আমার (প্রকৃতির) প্রকাশের যে মূল্যটা, সেটা উপলব্ধি করতে পারতে না। একই সময়ে সবকিছু সাজানো রয়েছে। অন্ধকার আছে বলেই আলোর যে বিকাশটা বুঝতে পারছো এবং আলোমুখী হবার চেষ্টা করছো। যদি অন্ধকার নাই থাকতো, তাহলে অন্ধকার সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতাই থাকতো না। সবাই আলোমুখী হয়ে আলোতেই থাকতো।

বিবেক কি? বিচারটা কি? কি করে বিবেক? ভাল-মন্দ বিচার করার বুদ্ধি না থাকলে, তখন 'বিবেক' সম্পর্কে চিন্তা করতে হতো, সেটা বুঝতে সময় লাগতো, এই জন্ম-মৃত্যুর মতো। জন্ম-মৃত্যু আছে বলেই তারজন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা। রোগ আছে বলেই চিকিৎসকরা রোগ নিরাময়ে নেমে গেল। চিকিৎসা শাস্ত্রটা বেরিয়ে গেল। রোগ না থাকলে চিকিৎসা শাস্ত্র আবিষ্কৃত হতো না। এত যে চিকিৎসার বিষয়বস্তু রয়েছে, এত যে খুঁটিনাটি রয়েছে, এত যে দেহের যন্ত্রপাতি রয়েছে, এই ত্রুটিগুলো আছে বলেই, রোগ আছে বলেই, মৃত্যু আছে বলেই চিকিৎসকরা এদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বাঁচিয়ে রাখার জন্য কত তার প্রক্রিয়া, কত তার ব্যবস্থা, কত তার চিকিৎসা, ঔষধপত্রের কত ব্যবস্থা; গাছ গাছড়া থেকে আনার ব্যবস্থা, মাটি থেকে খনন করে আনার ব্যবস্থা, আরও কত ব্যবস্থা। সবাই নেমে গেল এই ব্যবস্থাকল্পে। ব্যবস্থাকল্পে কখন নামে? একটা অভাব থাকলেই তো নামে। তাই প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমি (প্রকৃতি) একটা gap (ফাঁক) দিয়া দেই যাতে চালনা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেই চালনা শক্তির মাধ্যমে যাতে হামাগুঁড়ি থেকে আছাড় খেয়ে খেয়ে হাঁটা শিখে নিতে পারে। ঠিক সেইরকম তোমাদের হাঁটা শিখবার জন্য এমনভাবে নানারকম পরিবেশ সৃষ্টি

করে রেখেছি যে, তোমরা আঁকড়িয়ে ধরবে, বাঁচতে চাইবে, জানতে চাইবে। সুতরাং এভাবেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ development-এর পথে কিভাবে যেতে হয়, তার প্রক্রিয়াগুলো, process-গুলো আমি দিয়ে রেখেছি। এগুলো সব process, এগুলো সব প্রক্রিয়া। ব্যবস্থাগুলো কার? এগুলো না থাকলে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তো না। কেউ এগোত না। কেউ জানতে চাইতো না এবং জানার আগ্রহও জন্মাত না। একেকটা সৃষ্টির ভিতর দিয়ে কত রকমারী এগিয়ে গিয়েছে। একেকটা রূপ কত রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় কত রূপ। **সৃষ্টির ধারাপাতায় বহু রূপ, বহু ভাব, বহু সুর, বহু স্বর, বহু ধারা। প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাদের মস্তিষ্কের ধারণা, তোমাদের চিন্তাধারার ধারণা, তোমাদের চিন্তায় অনুভূতির ধারণা তোমাদের বিবেকের চালনায় কার্যকরী হচ্ছে।** তোমাদের বিবেকশক্তির কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার ধারাটা, তার চালনা প্রক্রিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমাদের সজাগ করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা এবং ঐ ব্যবস্থা থেকেই যাতে তোমরা অগ্রসর হতে পার, যাতে তোমরা অগ্রসরমুখী হও, তারজন্য এই সবগুলি হলো ব্যবস্থামূলক কাজ। তুমি যে প্রকৃতির সাথে হাত মিলিয়ে চলবে, চলতে গেলে যেসব step দরকার, সেইসব step গুলোর ব্যবস্থা আমি (প্রকৃতি) চারিদিকে অগণিত বিষয়বস্তুর ধারায় রেখে দিয়েছি। তাদের অবলম্বন করে করে তোমরা পাহাড়ে উঠবে, উঁচুতে উঠবে। তারজন্যই এসবের ব্যবস্থা। প্রকৃতি বলছে, আমি ধারাবাহিক সব দিয়ে দিয়েছি। কতগুলো step, কতগুলো স্তর? এই স্তরগুলো অতিক্রম করতে হবে। অগণিত স্তর, অগণিত বিষয়বস্তু দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং কোথায় কোন্ পর্দায় টিপতে হবে, সেগুলো harmony-তে সব রয়েছে। বেসুরে harmony-তে গেলে যে বেসুরে বাজবে, সেটাও তোমার harmony-তে রয়েছে। তুমি বুঝতে পারবে যে, এটা বেসুর। তুমি যদি বুঝতে না পার, তবে হ'ল একটা কথা। তুমি ভালই বুঝতে পারবে। বেসুরে বাজিয়ে কাউকে যদি তুমি অসুবিধা করো, তুমি নিজেই সেটা করছো, বুঝে শুনেই করছো।

প্রকৃতি বলছে, আমার একটি কাজও নেই, যা তোমার অজান্তে তুমি করছো। তোমার জানার ভিতর দিয়েই তুমি সবকিছু করছো। কাউকে যদি

চিৎকার করে অসুবিধার সৃষ্টি করো, তুমি জেনেশুনেই করছো এবং জেনেশুনে যখন তুমি করছো, সেখানে তো আমার দায়িত্ব কিছু নেই। আমার তো তোমাকে সবকিছু দেওয়া রয়েছে। যদি না জানতে, না বুঝতে সেটা আলাদা কথা। না জেনে যদি আগুনে হাত দিতে সেটা আলাদা কথা। আগুন যে গরম, তুমি আগে থেকেই বুঝতে পারছো। তবু কেন তুমি আগুনে হাত দিয়ে বসে আছ? বসে বসে আগুনে হাত দিয়ে হাত পোড়াচ্ছ? সব কিছু রয়েছে তোমার মধ্যে এবং সবকিছুর মধ্যে তোমার বিবেক সজাগ রয়েছে, সচেতন রয়েছে। তোমাকে সবসময় জানিয়ে দিচ্ছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপরেও তুমি যদি সেইপথে (বিপথে) যাও, তুমি স্ব-ইচ্ছায় সেইপথ অবলম্বন করছো। সেই পথটায়, সেখানে দুর্ভোগ, জেনেশুনে যখন তুমি খারাপের পথ মাড়াচ্ছ, জেনেশুনে তুমি দুর্ভোগকেই টেনে আনছো। দুর্ভোগের পথে গেলে দুর্ভোগকেই টেনে আনবে। ব্যাস, পরিষ্কার কথা। সুতরাং যেখানে তুমি দুর্ভোগ টেনে আনছো, সেখানে suicide-এর মত অবস্থা। **তোমার জীবন তুমি ইচ্ছা করলে বাঁচাতে পার, আবার যে কোন মুহূর্ত্তে নষ্ট করে দিতে পার। সেই ক্ষমতা তোমার হাতেই অর্পণ করা হয়েছে এবং সবটার মধ্যে আমার (প্রকৃতির) দেওয়া সজাগ (বিবেক) রয়েছে, তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে।** তোমাকে সজাগ যদি করে না দেওয়া হতো, তবে তুমি প্রকৃতিকে দায়ী করতে পারতে। আমার (প্রকৃতির) সজাগ বস্তু সজাগকে, সজাগ করাকে যখন তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে, সেখানে তো আমার কোন বক্তব্য নাই। তোমাদেরও কিছু বলার নাই। তোমাদের সজাগ করে দিচ্ছি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে।

'তিনিই করাইতেছেন' যখনই তুমি বলছো, তুমি আটকে গেলে 'তিনিই করাইতেছেন,' তুমি বুঝছো তো। 'তিনিই করাইতেছেন,' সত্যিই 'তিনি করাইতেছেন।' আবার 'তিনিই করাইতেছেন' যে, 'এটা করা উচিত নয়,' বুঝছো কি না। তুমি যখন বুঝছো, এটা করা উচিত নয়, তখন তিনিই তো বুঝাচ্ছেন যে, 'এটা করা উচিত নয়।' তাহলে কেন বলছো, 'তিনিই করাইতেছেন।' তাহলে কেন করতে গেলে? তুমি বুঝতেছ লাফ দিয়ে পড়লে মৃত্যু। কেন লাফ দিতে গেলে? 'তিনিই করাইতেছেন,' এটা যদি মনে প্রাণে

থাকে, তাহলে বক্তব্য কিছু নাই; 'তিনিই করাইতেছেন।' কিন্তু 'করাইতেছেন'-এর মধ্যে কাজটা যে ঠিক নয়, সেটা তো তিনিই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বিবেক কখনই Permission (অনুমতি) দেবে না, ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ো। কক্ষণোই দেবে না। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ। তুমি যদি একজনের হাত মোচড় দিয়ে ধরো, তাকে ব্যথা দাও, বিবেক বলবে, 'ব্যথা দিতে যাচ্ছ কেন?' বিবেক তোমাকে guard দেবেই দেবে। এখানে একজনকে যদি তোমার মারতে হয়, বিবেকই তোমাকে বলবে, 'একে মার দাও।' বিবেকই তোমাকে guide করবে। তোমাকে একজন মারছে। তুমি মৃত্যুর পথে। তখন বিবেকই বলে দেবে উপায় নাই, তাকে তখন মারতেই হবে। সুতরাং তখন মনে প্রাণে আসবে, বিবেকই বলছে, save yourself first. save you. তুমি saved হও। তখন বিবেকই তোমাকে help করবে। সেখানে (তোমার) বিবেকের স্বচ্ছ মন এবং মুখ, ভিতর এবং বাইর এক হয়ে যাবে। তখন যে তোমাকে বিপদে ফেলছে, সে হবে কাঁটা। সেই কাঁটা সরিয়ে দিতে বিবেক তোমাকে বলবেই বলবে। তখন তুমি তারজন্য যা কাজ করবা, বিবেক তোমাকে guide করবে প্রতি মুহূর্ত্তে। এর আর কোন সাফ সাফাইর পথ নাই। এর কাছে লুকাবার কোন পথ নাই। এর কাছে এড়াবার কোন পথ নাই। অন্যের কাছে এড়াতে পারবে, বাইরে এড়াতে পারবে। কিন্তু ভিতরে যে seal, যে natural gift রয়েছে, তোমার ভিতরে এবং বাইরে যে guard প্রকৃতি দিয়া দিছে, এই guard-এর (বিবেকের) থিকা (থেকে) রক্ষা পাওয়া মুস্কিল।

বিবেক প্রতি কণাতে কণাতে প্রত্যেককে guard (পাহারা) দিয়া চলছে। কোথায় তুমি মনে মনে ভাবতাছ। 'কেন তুমি ভাবতাছ? এইটা ভাবা কি উচিত?' তুমি মনে মনে একজনকে ভাবতাছ। বিবেক বলছে, কেন ভাবতাছ? ভাবা কি উচিত? ভাবা তো উচিত নয়। বিবেকই ভিতরে ভিতরে কথা কয়। কথা বলবে কি অন্যে? 'ঐ ব্যাটা কি ভাবছিস্?' বইসা বইসা (বসে বসে) চিন্তা করবা আকাশ কুসুম, আর ভাববা, 'ওরা তো কেউ জানবে না। আমি বইয়া বইয়া (বসে বসে) চিন্তা করি।' আর কেউ না জানুক, তুমি তো জাইনা (জেনে) ফেলাইলা যে, এটা করা উচিত নয়। আকাম যে

করতাছ, বিবেক তো জানাইয়া দিল তোমারে, 'তুমি এইসব চিন্তা করতে যাচ্ছ কেন?'

বিবেক তোমাকে সাড়া দেবে, 'আমার গভীর সুরে তুমি থাক।' তুমি বলবে, 'হে পিতা, আমাকে সুরে নিয়ে যাও। আমাকে সুরে পৌঁছিয়ে দাও'। তখন বিবেক বলবে, 'এবার তো তুই ঠিক আছোস্ (আছিস্) রে। এবার তুই যা।' তখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এমন সুন্দর একজন বড় চিকিৎসক তোমার পিছনে রয়েছে, এমন একজন সুবিচারক তোমার পিছনে রয়েছে, এত সুন্দর ব্যবস্থা তোমার জীবনে রয়েছে, সেখানে তো আর কোন বক্তব্য নাই। কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই। কি চমৎকার তাঁর (প্রকৃতির) মহাদান। তোমার ভিতরে রয়েছে, কি সুন্দর natural gift. এত সুন্দর সেই পবিত্র দান, সেই gate-keeper রয়েছে তোমার যে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমার পিছনে পিছনে একেবারে ছায়ার মত লেগে রয়েছে। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নাই। তুমি ভাবলে, 'আমি ফাঁকি দিলাম সবাইরে।' ফাঁকি দিলা তুমি অরে (অন্যকে)। বাইরের লোককে ফাঁকি দিতে পার। তুমি মহাপুরুষ, জমিদার সাজতে পার, রাজা সাজতে পার। তুমি তো বুঝতে পারছো, আমি সাজলাম। এর হাত থেকে তো তুমি রক্ষা পাইতেছ না। তাই নিজের কাছে নিজে ফাঁকি দিতে আর পারবে না।

বিবেক তোমাকে মাথায় টোকা দিয়ে (মাথা ঠুকে) বলে দেবে, 'ঐ ব্যাটা কি সাজতাছোস্?' বিবেক বলে দেবে, 'ঐ রাজা, মহাপুরুষ সাইজা (সেজে) তোর লাভ কি রে ব্যাটা?' বিবেক সব সময় বলে দেবে। যে সাজছে, তাকে বিবেক বলছে, 'কেন তুমি ঐ সব সাজতে যাচ্ছ? আমার এই দান আছে বলেই তুমি তার অপব্যবহার করছো কেন? আমার দান দেওয়া আছে, ক্ষমতা দেওয়া আছে। তুমি তার সদ্ব্যবহার করো। তুমি তা করতে পার, যদি বোঝ তোমার প্রয়োজনে লাগবে।'

যে ভুল করছে, বিবেক তাকে বলছে, 'তোমার তো এটার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ কেন?' ঠকাচ্ছ যখন বুঝতে পারছো, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। অঙ্ক ভুল। অঙ্ক মিলছে না। বিবেক তোমাকে জানিয়ে দিল,

'এইখানে ভুল।' ব্যাস, পরিষ্কার হইয়া গেল। তুমি যদি বলো, 'আমি ভুল অঙ্কই করুম'। কর গিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝ তোমার রইছে, ততক্ষণ তুমি ফ্যাসাদে পড়বা। পারছি না, পারতাছি না তো। না পারলে আবার চেষ্টা করো। **'পারছি না' বললে, যদি বিবেক কিছু না বলতো, তবে ঠিক আছে। কিন্তু বিবেক সচেতন করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। একে ওকে গালি দিচ্ছি, অন্যায় করছি। বিবেক যদি বুঝিয়ে না দিত, কিছু না বলতো, তাহলে কথা ছিল।**

'আমি খাচ্ছি', অন্যায় করছি। 'আমি মারছি', অন্যায় করছি, বিবেক বলছে, তুমি বুঝতাছ তো?

—হ্যাঁ বুঝতাছি।

তাইলে আমি (বিবেক) ঠিক আছি।

সে (বিবেক) তার কাছে নিয়ে নেবার জন্য, তার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমাদের থেকেও বেশী চেষ্টা করছে।

আর আমরা কি করছি? প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবেককে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলছি। তাকে (বিবেককে) ধাক্কা দিয়ে যে চলছো, এটা তো বুঝতাছ?

—হ্যাঁ বুঝছি।

তাইলে আমার (বিবেকের) কোন বক্তব্য নাই। তুমি যদি ঠেলাটা দিয়া না বুঝতা তাহলে একটা কথা ছিল। একটা বাচ্চা শিশুও যখন যায়, হামাগুড়ি দিয়া দরজার দিকেই যায়। দেওয়ালের দিকে ঢুকতে যায় না। সে যদি বুঝতো দেওয়াল দিয়া ঢুইকা (ঢুকে) যাব, তাইলে একটা চিন্তা ছিল। ফাঁকি দেওয়া যাবে না। একেবারেই না, একেবারেই না। বুঝ অবুঝ সবটাই তাঁর (প্রকৃতির) মহাদান। কোন্‌টা কার করা উচিত, সেইটাও তিনি (প্রকৃতি) বইলা (বলে) দিতেছেন। ব্যাস্, ব্যাস্। সব কিছু তোমার আছে। তুমি যদি এখন চালে ডালে মিশাইয়া (মিশিয়ে) বাছতে শুরু করো, তাহলে কার কি করার আছে? দুর্ভোগের পথে গেলে দুর্ভোগ তোমাকেই ভোগ করতে হবে। দুর্ভোগ তোমাকেই টানতে হবে। সে (বিবেক) বলছে, 'আমার পথ পড়ে

রয়েছে। যে পথে যাবে, সেই পথেই জিনিস পাবে। দুর্ভোগের পথে গেলে দুর্ভোগ পাইবা। কতবার না করছি, যাও কিসের জন্য? না না না করে যাচ্ছি। নিষেধ করছি, যাচ্ছ কেন?'

তুমি বলছো, যাব, যাব, যাব।

—যাও।

তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে যে কাজ করবে, তার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। এটাকেই বলা হয়, কর্মের ফল। সেখানে অন্য কোন কিছু নাই। অন্য কোন কথা নাই। অন্য কোন কিছু আসবে না। তুমি মনে কোর না, তিনিই মারছেন, তিনিই ধরছেন, তিনিই গুছাচ্ছেন। সত্যি কথা তিনিই সব করছেন। তাঁর বিষয়বস্তু দিয়েই তিনি সব করছেন। বাড়ীওয়ালার দা, তার দড়ি, তার লাঠি, তার সব। তার জিনিস দিয়েই তারে মারতাছি, তার জিনিস দিয়েই সব কাজ করতাছি। তা সত্যি কথাই। সবই সত্যি কথা। আবার সেসব দিয়ে রক্ষা করাও তো যায়। সেটাও তো তোমাকে বলে দিয়েছে। সুতরাং কোনটা দিয়ে কি হবে, কোনটা বেশী হবে, কোন্‌টা কম হবে, কোনটা কি হবে না হবে, কোন্‌টা দিয়ে কি করবে, তারজন্য দায়ী কেউ নয়। তারজন্য দায়ী হবে তুমি। তার (প্রকৃতির) বিষয়বস্তুতে সব কিছু রয়েছে। তুমি যদি হারমোনিয়ামের উপরে তরকারির ডালা রাইখা (রেখে) দাও, কে কি বলবে? কোন অর্থ হয় না। এটা তরকারি রাখার জায়গা নয়। তবু রাইখা দিছ থাকবে, মরবে। মারামারি কইরা (করে) বিড়ালটা কুয়াতে পইরা গেছে। তাকে তোলার ব্যবস্থা যদি কর, বাঁচবে, না হলে মরবে।

তিনিই আছেন। তিনিই দেখছেন। তিনিই দেখবেন। তিনিই সব করবেন। তিনিই সব করাচ্ছেন। সব কথাই সত্যি। তিনিই সব করাচ্ছেন। অস্বীকার করছি না। সব তিনি করাইতেছেন। কিন্তু তোমার হাতে ক্ষমতাগুলি দিয়েছেন। তিনি (প্রকৃতি) বলছেন, এইগুলি তোমার হাতে আমি দিয়া দিছি। এইগুলি নিয়া এখন তোমার মতে তুমি চল। ক্ষমতা হাতে না দিয়ে সে কিছু বলেনি। সব দিয়ে দিয়েছে। কে বোঝে, কে বোঝে না, সে দেখবে

না। যারা বোঝে না, তারা তো এইটা বুঝতাছে যে, কাজটা আমরা ঠিক করছি কি বেঠিক করছি। আমি সব কথা মেনে নেবো, এই কথাটা যদি না বোঝে যে, 'কাজটা আমি করছি।' এই কথা যদি না বুঝতো, তাইলে আমি মাথা নত করতাম যে, না বোঝেই নাই। এইখানে এমুন করলে, অমুন করলে বুঝা যায়। পাউডার দিয়া গেলে বুঝা যায়। সে যা কিছু করতাছে, বুইঝাই করতাছে। মুখে তো ময়দা মাইখা (মেখে) যায় না। ময়দা মাইখা গেলে বুঝা যাইব, পাগল সাজনের লইগ্যা করতাছে, না সাধু সাইজা (সেজে) পালাইবার লইগ্যা (জন্য) করতাছে।

এইটাই (বিবেক) হইল, দেবতা। দেবতা কোন্‌টা? ভগবান কোনটা? বাবা, বুঝতাছি সচেতন (বিবেক) কি সাংঘাতিক। এরে কেউ টলাইতে পারবে না। তার (বিবেকের) পথে না যাওয়া পর্যন্ত, সে কারও সাথে হাত মিলাবে না। আর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে সজাগ করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। এ যে কতবড় মহাদান, কত বড় যে উপকার, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ব্যথাটা আছে বলেই তো বেঁচে আছো। নাহলে তো সব শেষ হইয়া যাইত। নাহলে একটা হাড়ও আস্ত থাকতো না। ব্যথাটা আছে বলেই তোমরা বাঁইচা (বেঁচে) আছো। ব্যথাটা 'উঃ' আছে বলেই দেহটা এখন পর্যন্ত রক্ষা পাইতাছে। চিপি খাইলা, উঃ করলা। মারামারি করলা, চোট পাইলা উঃ করলা। যাই হোক ব্যথা বোধটা আছে বলেই তোমরা টিকে আছ। ব্যথাটা যদি না থাকতো, একটাও হাড়ে মাসে টিকে থাকতো না। কি চমৎকার দেখতো। 'উঃ' টা আছে বলেই রইলা (থাকলে)। না হইলে হাড়ে মাসে একটাও বাঁইচা থাকতে পারতা না। যাইহোক, ব্যথা বোধটা আছে বইলাই তুমি এখন পর্যন্ত টিকে আছো। এই বোধটা যদি না থাকতো, তবে একটা হাড়ও ঠিক থাকতো না, একেবারে গুঁড়ো হয়ে যেত।

ঠিক এইরকম ব্যথা বোধের মত বিবেক বোধটা আছে বলেই সর্বকালে টিকে থাকার মত ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবস্থাগুলো রয়েছে বলেই, আমরা বেঁচে আছি। আমরা যদি উঃ না করি, সেই বোধ থেকেই ব্যথা পেয়েও আমরা

যদি উঃ না করি, তাহলে মার খেতে হবে। অঘটন ঘটবেই। **উঃ হলো মাপকাঠি। দেহের মাপকাঠি হল ব্যথা। আর জীবনের চলার পথের মাপকাঠি হলো বিবেক**। প্রত্যেকের অন্তরের অন্তরে একেবারে সুন্দর সাথী হয়ে আছে। একটা কাজ করছো, আরেকটা কর্ত্তব্যে টানছে। সংসারের কাজ করে চলেছো। সময় হয়ে গেল। লোকজন এসে পড়বে। দেখা করতে হবে। পাঁচজন বসে আছে। রান্না করে খাওয়াতে হবে। তাদের অফিস আছে। ট্রেন ধরতে হবে। এক জায়গায় বসে কতগুলি চিন্তা করতাছ তুমি। এই বিবেক বোধ যদি না থাকতো, তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারতে? এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কত কাজের কথা ভাবছো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো কিন্তু। বাথরুমে যেতে হবে। কাপড়গুলো পরিষ্কার করতে হবে। ধোয়া কাপড়গুলো মেলা আছে কিনা। রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। দাঁড়িয়ে আছো কিন্তু এখানে। আবার এক জায়গায় বসে কত চিন্তা করছো। ঘরটায় পাহাড়া আছে কি না। ফ্যানটা খালি ঘরে ছাড়া আছে কি না, দেখা উচিত। কি সুন্দর বিবেক। Conscious, Always consicious. **সর্বকাজে conscious করে দিচ্ছে। এতবড় দানটাকে তোমরা অযথা নষ্ট করছো, ঠেলে নষ্ট করে দিচ্ছো, জেনেশুনে নষ্ট করছো। একে সুইসাইড (আত্মহত্যা) বলে। এর আর কোন ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই।** তোমরা ক্ষমা চাইবে কার কাছে বল? নিজেরা জেনেশুনে নষ্ট করছো, শেষ করছো। মদ খেয়ে জীবনটা নষ্ট করছো। কেন? তোমরা সুন্দরভাবে চল। বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে বিবেকের পথে চল।

প্রকৃতি বলছেন, তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) তো এদের জন্য আফশোস করছো। এরা (ভক্ত শিষ্যরা) তোমাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) নিতে পারছে না। তুমি এদের (ভক্ত শিষ্যদের) অনেক কিছু দিতে পারতে। এরা অযথা নিজেদের ঝগড়া, বিবাদ, অশান্তি নিয়ে তোমাকে বিব্রত করছে। এসবে তোমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কোন প্রয়োজন নাই। এগুলো এরাই (ভক্ত শিষ্যরা) সমাধান করতে পারে। কিন্তু এরা এগুলো করছে না। তোমার কাছে এরা বিচার চায়। এগুলির বিচার তো তোমার করার প্রয়োজন নাই। তোমার যে জিনিস দেওয়া দরকার, তোমার যা করার ইচ্ছা আছে, এদের জন্য যা

করতে তুমি চাও, এরা তোমাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) দিতে দিচ্ছে না। সেজন্য কারা দায়ী? এদিকে তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) সময় পাচ্ছ না। এতগুলি লোক (দর্শনার্থী) রয়েছে, কত দূর দূর থেকে তারা আসে। একটা মুহূর্ত্ত তোমাকে পাচ্ছে না। এরা (দর্শনার্থীরা) পেলে কত উপকৃত হতো। এদের জন্যও তো তোমার কাজ করা উচিত। সুতরাং তোমার হয়েছে সমস্যা। এরপরেও তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) যেটা ভাল মনে করছো, করে যাচ্ছ। অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে করে যাচ্ছ। আফশোস করে করছো। দুঃখ করে করছো। শরীর অসুস্থ নিয়ে করছো।

বিবেক বলছে, আমি তো বলছিই, তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) কি করবে? তুমি তো কোন গাফিলতি করছো না। ক্লান্ত হয়ে পড়ছো। তবু তুমি করে যাচ্ছ। বিশ্রাম তুমি নিচ্ছ না। **তোমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি সবার দিকে তাকিয়ে বিবেকের সঙ্গে হাত মিলাতে চাও। বিবেক তো সেইজন্য দুঃখ পেয়েও বলছে, তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) বিশ্রাম নাও। চেষ্টার তোমার ত্রুটি নাই। অন্তরের চেষ্টার ত্রুটি নাই।**

একজন দরিদ্র সন্তান। বাবা এসেছেন তার বাড়ীতে। বাবাকে ভাল জিনিস খাওয়াবে, পারতেছে না। তারজন্য দুঃখ করছে, আফশোস করছে, বাবাকে জানাচ্ছে। তাতে তিনি বেশী তৃপ্তি পাচ্ছেন। খাওয়ার চেয়েও বেশী তৃপ্তি পাচ্ছেন সন্তানের আন্তরিকতার দিকে তাকিয়ে। বিবেক বলছে, সেই রকম তোমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) আন্তরিকতা রয়েছে। তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) দিতে চাও, বুঝাতে চাও। কিন্তু এরা নিতে চাচ্ছে না। এরা যে কেন নিতে চাচ্ছে না, সেটাই আশ্চর্য। তোমার ইচ্ছা থাকলেও মনে হয়, এরা চায় না। আর বললেও সেভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। ওদের বিবেক তো ওদের guard দিচ্ছে, 'তোরা এভাবে সময় নষ্ট করছিস্ কেন?' ওদের বিবেক তো ওদের guard দিয়ে যাচ্ছে। আমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) বিবেক আমাকে জানাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমি কি করবো?

আমার বিবেক আমাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) বলছে, তোমার চলার পথে তোমার কোন ত্রুটি নাই। তোমার দিক থেকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন ত্রুটি

নাই। তুমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) যে অবসর নেবে, তুমি তো কাউকে বঞ্চিত করতে পারছো না। তোমার তো সেদিকেও খেয়াল আছে। খেয়াল করে করে তুমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করছো। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে এত পরিশ্রম করে আরও কত অসুস্থ তুমি হয়ে পড়ছো। তোমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) আন্তরিকতার দিক থেকে বিবেক তোমাকে দায়ী করতে পারছে না। তোমার এদিকে খেয়াল আছে, সবদিকে খেয়াল আছে। বিবেক তোমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) উপরে খুব খুশী আছেন, সুপ্রসন্ন আছেন, এইজন্য যে তুমি বিবেককে ফাঁকি দিচ্ছ না।

এই দেহবীণাযন্ত্রের মাধ্যমেই বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে গতির পথে অগ্রসর হতে হবে, প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে গতি মিলাতে হবে। চোখের দৃষ্টি, অনুভবের দৃষ্টি, স্পর্শের দৃষ্টি এগুলো সব দৃষ্টি সমতুল্য। স্পর্শ দৃষ্টি সমতুল্য, অনুভব দৃষ্টি সমতুল্য, উপলব্ধিটা দৃষ্টি সমতুল্য। সুতরাং ভাব ভাবনা, চিন্তা, মনন সবই দৃষ্টি সমতুল্য। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই একই ধারায় প্রবাহিত। তাই অনুভব দিয়ে যাহা অনুভুতিতে আনো, তাহাও দৃষ্টিবৎ, দৃষ্টি সমতুল্য। তোমাদের ভিতরে সেইভাবেই সেই শক্তিগুলো বিদ্যমান। সেইভাবেই তোমাদের দেহে সেই অনুভূতিসম্পন্ন চক্ষু রহিয়াছে। **বিবেক প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে guide করে করে চলেছে। তাই বিবেকের সাথে হাত মিলানো ছাড়া আর কোন গতি নাই। হে পথিক, হে যাত্রিক জীবনের চলার পথে পাথেয় সঞ্চয় করো। বিবেককে সাথের সাথী করে অনন্ত গতির পথে যাত্রা শুরু করো। আজ এই থাক।**

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
২) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
৩) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান